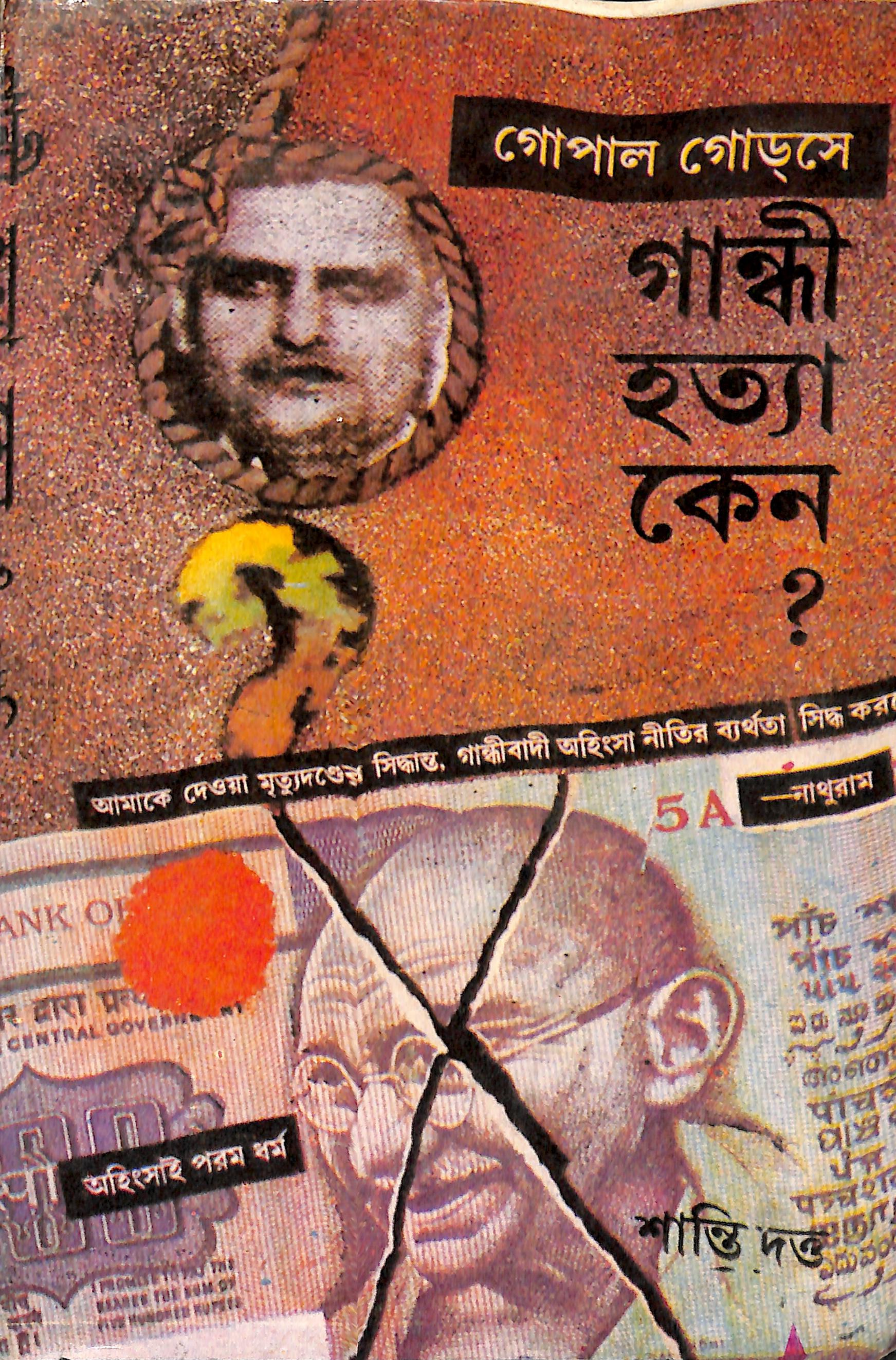

গোপাল গোড়সে
গান্ধী হত্যা কেন ?
আমাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত, গান্ধীবাদী অহিংসা নীতির ব্যর্থতা সিদ্ধ করল
—নাথুরাম
5A
অহিংসাই পরম ধর্ম
শান্তি দত্ত

2

গান্ধী হত্যা কেন?

(নাথুরাম ভ্রাতা শ্রী গোপাল গোড্‌সে রচিত
মারাঠী পুস্তক "পঞ্চায়ন্ন কোটীন্‌চে বলি"র অষ্টম সংস্করণের ও
"গান্ধী হত্যা আনি মী"র আংশিক বঙ্গানুবাদ)

অনুবাদক

॥ শান্তি দত্ত ॥

স্পেশাল এগ্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বম্বে

মহাজাতি প্রকাশন

কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
মাঘ, ১৪০০
কলিকাতা বইমেলা
জানুয়ারী, ১৯৯৪
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
বইমেলা, ১৯৯৬
তৃতীয় প্রকাশ ঃ
কলকাতা বইমেলা, ২০০৪

Gandhi Hatya Keno
by Gopal Godse.

প্রকাশক ঃ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত
মহাজাতি প্রকাশন
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—৭৩

পরিবেশক ঃ
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা—৯

টাইপ সেটিং ঃ
লেটার সেটার
১০, বৃন্দাবন বোস লেন
কলিকাতা—৬

মূল্য ঃ ৪০ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ
বরুণ সাহা

"গান্ধীহত্যা আজ ইতিহাস। ইতিহাসে সত্য ছাড়া
অন্য কিছুর স্থান নেই।
এই গ্রন্থ সত্য সন্ধানের এক সামান্য প্রয়াস মাত্র।"

প্রকাশকের কথা

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে, নবীন প্রকাশক হিসাবে কিছুদিন আগে আমি দুরু দুরু বুকেই আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম গান্ধীহত্যাকারী নাথুরাম গড়্‌সের জবানবন্দী। বিচারকের কাছে তাঁর আবেদনের সবটুকু ঐ বিচারশালাতে বন্দী থাকার জন্য ছিল না। তাঁর শেষ আবেদন ছিল জনতার হৃদয়ের কাছে, জনতার আদালতে। ঐ আবেদনেই উদ্বেলিত হয়ে প্রচলিত বিশ্বাসের বিরোধী চিন্তার এই বই আমি প্রকাশ করে শঙ্কিত চিত্তেই আপনাদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।

আজ শঙ্কা নেই। আজ বুঝেছি বাঙালী পাঠক যথার্থই ঐতিহাসিক সত্য জানার জন্য কৌতুহলী। তাই 'শুনুন ধর্মাবতার'কে আপনারা সাদরে গ্রহণ করেছেন। শুধু গ্রহণই করেন নি, এ বিষয়ে আরও নানা কথা জানবার আর্জি পেশ করেছেন আমার কাছে বিভিন্ন পত্রের মাধ্যমে। অসহায় আমি সন্ধানে থেকেছি।

পরে আকস্মিক ভাবেই জানলাম এ সব প্রশ্নে নাথুরাম ভ্রাতা গোপাল গড়্‌সেও উদ্‌ব্যস্ত হয়েছেন। সেসব প্রশ্নের উত্তর দিতে তাঁকে মারাঠী ভাষায় 'পঞ্চায়ন্ন কোটীন্‌চে বলি' এবং 'গান্ধী হত্যা আনি মী' ইত্যাদি বই রচনার মাধ্যমে সত্যকে উন্মোচন করতে হয়েছে। বম্বের স্পেশাল এগ্‌জিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেট শান্তি দত্ত বই দুটির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আমাকে পড়ে শোনান। আমি উদ্বেলিত হই। আমি এতদিন ত' এই রত্নের সন্ধানেই ছিলাম। এই গ্রন্থই দেবে কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকাদের গান্ধীহত্যা সম্পর্কিত সব প্রশ্নের উত্তর। এই নতুন গ্রন্থের মাধ্যমে সত্যসন্ধানী বাঙালী পাঠকের কৌতুহল নিরসন হলেই আমার এই কঠিন প্রকাশনার প্রয়াস সফল হবে।

'অনুবাদকের প্রতিবেদন'

পৃথিবীর আলো চোখে পড়ার কয়েক বছর পরেই রাজনীতির দমকা হাওয়ায় ছিটকে এসে পড়লাম পশ্চিম বাংলার এক উদ্বাস্তু শিবিরে। সেথা থেকে উদ্বাস্তু উপনিবেশে (Colony) শৈশব কাটলো। যৌবনের শুরুতেই পেটের দায়ে আবার ছুটতে হল প্রায় দু'হাজার কিলোমিটার দূর, সমুদ্রের ধারে বম্বেতে ! নিয়মিত বাংলা লেখা না পেয়ে স্থানীয় ভাষা অর্থাৎ মারাঠীতেই মনের ক্ষিদে মেটাতে সচেষ্ট হলাম। এমন সব লেখা হাতে পড়তে লাগলো যাতে মনে হত যারা এ ভাষা পড়তে পারেন না, ভাষান্তর করে, তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যায় না ? কিন্তু যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ বাংলায় জন্মেছিলেন কাজেই আমরাও সব ধর্মজ্ঞানী, যেহেতু রবীন্দ্রনাথ বাংলায় জন্মেছিলেন, কাজেই আমরা সব সাহিত্যজ্ঞানী আমাদের অন্য ভাষা বা সাহিত্য জানবার বা শিখবার কোন প্রয়োজন নেই— এ ধরনের মনোভাব এখানকার অনেক বঙ্গ-ভাষা-ভাষীদের মধ্যে দেখেছি বলেই আর হাত বাড়াতে সাহস হত না। তাছাড়া যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসেরও অভাব ছিল !

এই সময়ে হাতে পড়ল মহাত্মা গান্ধীর হত্যার দায়ে যাঁর ফাঁসি হল-সেই স্বর্গীয় নাথুরাম গোড়সের ছোটভাই যিনি নিজেও ঐ হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ডিত হয়ে ১৮ বছর দণ্ডভোগ করেছেন সেই শ্রী গোপাল গোড়সের লেখা "গান্ধী হত্যা আনি মী" অর্থাৎ গান্ধী হত্যা ও আমি এবং "পঞ্চায়ন্ন কোটীন্‌চে বলি" অর্থাৎ পঞ্চান্ন কোটীর বলি !

দেশ বিভাজনের সময় যে ভাগ বাটোয়ারার আলোচনা হয়েছিল। তাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, বিভাজনের পূর্বে অর্থাৎ অখণ্ড হিন্দুস্থানের কোষাগারে যে অর্থ জমা আছে তার শতকরা তেত্রিশ ভাগ (৩৩%) অর্থাৎ ৫৫ কোটী টাকা পাকিস্তান পাবে। আর অন্যান্য সম্পত্তির-ও শতকরা তেত্রিশ ভাগ (৩৩%) পাবে পাকিস্তান। তার মধ্যে অন্যান্য সম্পত্তি অর্থাৎ কলকারখানা ইত্যাদি যার এলাকায় যা পড়েছে তার মূল্য নির্ধারণ করে নিজেদের পাওনার চেয়ে বেশী হলে, সেই দেশ, তা নগদ মূল্যে অন্য দেশকে ফিরিয়ে দেবে বলে চুক্তি হ'ল। সেই চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তানের কাছ থেকে হিন্দুস্থানের সাতাশ কোটী টাকা প্রাপ্য !

কিন্তু যে ঋণ (Market Loan, Fixed Deposit Etc) ছিল তার মাত্র শতকরা সাড়ে সতের ভাগ (১৭.৫%) অর্থাৎ তিনশো কোটী টাকা, চার কিস্তিতে দিতে পাকিস্তানের নেতারা রাজী হল। আর বাকি সাড়ে বিরাশী ভাগ (৮২.৫%) দিতে হবে হিন্দুস্থানকে। হিন্দুস্থানের নেতারা তাও মেনে নিলেন। কাজেই নীতিগত দিক দিয়ে

পাকিস্তানকে টাকা দেওয়ার প্রশ্নতো ওঠেই না বরং হিন্দুস্থানেরই টাকা প্রাপ্য। [হিন্দুস্থান শাসনের মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির জন্য যা আজও—এই ১৯৯২ তেও আদায় করা হয়নি। এই টাকা প্রত্যেক বছর কেন্দ্রীয় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় অধিবেশনে বার্ষিক আয়ব্যয়ের হিসাবে পাকিস্তানের কাছে প্রাপ্য বলে দেখানো হয়।]

আবার এদিকে স্বাধীনতা (?) পাওয়ার ছয় সপ্তাহের মধ্যেই পাকিস্তান, হিন্দুস্থানের উপর আক্রমণ করায় সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মত শাসনকর্তারা বুঝতে পারলেন যে ঐ ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হলে পাকিস্তান তা দিয়ে আরও অস্ত্রশস্ত্র কিনে হিন্দুস্থানের উপর ব্যাপক ভাবে আক্রমণ করবে। তাই তারা ঐ টাকা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু গান্ধীজী সেই টাকা দেওয়ার জন্য হিন্দুস্থান শাসনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন এবং শেষ পর্যন্ত অনশন শুরু করলেন। মাউণ্ট ব্যাটেন তখন গভর্নর জেনারেল, শাসনের এক দায়িত্বশীল অংশ হওয়া সত্ত্বেও শাসনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গান্ধীজীর এই কাজকে উৎসাহ দিয়ে বললেন "It is a very bold step", গান্ধীজীর **এই আচরণ নিজের দেশের সর্বনাশ করেও পৃথিবীর লোকের সামনে নিজেকে "মহামানব" বা "দেবতুল্য পুরুষ" বলে প্রতিষ্ঠিত করার এক জঘন্য প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়,** তাঁর এই খামখেয়ালীপূর্ণ জঘন্য প্রয়াসের প্রভাবে হিন্দুস্থান শাসন নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ৫৫ কোটী টাকা পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য হ'ল। সেই টাকা হাতে পাওয়ার পর পাকিস্তানের আক্রমণ হল আরও তীব্র। আর তাতে হিন্দুস্থানের যেসব নরনারী পাকিস্তানের হাতে মারা পড়লো, তাদের এই মৃত্যুকেই (আর ঐ ঘটনায় ক্রুদ্ধ হয়ে নাথুরাম গান্ধীজীকে হত্যা করল) বলা হয়েছে "৫৫ কোটীর বলি"।

বই দুটো পড়ে আমার বন্ধুবর শ্রী শ্যামল চৌধুরীকে যখন বাংলায় বোঝাতে লাগলাম, তাঁর মুখ থেকে বেরোল "কই এই ইতিহাস তো কখনও পড়িনি" ! তারপর তাঁরই আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় ভাষান্তরের কাজে হাত দেওয়ার আগে ১৫ই আগষ্ট যখন মূল লেখকের বাড়ীতে পুনে (পুনা শহরের আসল নাম) গেলাম, তিনি হাতে দিলেন শ্রী নীরদবরণ হাজরার ভাষান্তর "শুনুন ধর্মাবতার" দেখে খুব ভাল লাগল। কিন্তু লেখার প্রথম উদ্যম এই ভাবে অঙ্কুরেই বিনাশ হল দেখে মনের কোণে কোথাও যে লাগেনি একথা লিখলে মিথ্যে লেখা হবে! কিন্তু বইটা পড়ে দেখলাম, গোপাল বাবুর লেখা বইয়ের সম্পূর্ণ ভাষান্তর নয়, অংশবিশেষ। নাথুরাম গোড্‌সে ন্যায়ালয়ে যে বক্তব্য রেখেছিলেন, যা গোপালবাবু পুস্তকরূপে "May it please your Honour" নাম দিয়ে ইংরাজীতে প্রকাশ করেছেন সেই ইংরাজীর ভাষান্তর। গোপালবাবু আমাকে বাকিটা ভাষান্তর করতে অনুমতি দিলেন। উৎসাহ ফিরে পেলাম কিছুটা ভাষান্তর করে ওনাকে দেখাতে অনেক কাটাকাটি করলেন। উদাহরণস্বরূপ—"আদালত", "পেশ", "সরকার", "দরকার", "জমিজমা", "বদলী", প্রভৃতি শব্দ হয় বিদেশী শব্দ অথবা তার অপভ্রংশ এই কারণে, কারণ ওনার নির্দেশ ছিল বিদেশী ভাষার মিশ্রণ যেন না থাকে। সেই নির্দেশ সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা মানতে গিয়ে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে!

যাইহোক শেষ পর্যন্ত ভাষান্তর করে ১৫ই নভেম্বর তাঁর হাতে দিলাম। যোগাযোগ এমনই যে নাথুরামের ফাঁসি হয়েছিল ১৫ই নভেম্বর।

গান্ধীহত্যার মূল কারণের সাথে বাংলায় সংঘটিত অত্যাচারের কাহিনী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয় তাই বাংলার বিভাজনগঠিত অত্যাচার ও নির্যাতন এর বর্ণনা এই বইতে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি!

এই পুস্তকে উদ্ধৃত ঘটনার সত্যাসত্য ঘটনা পড়ে ও তার সাথে দেওয়া দলিল (Documents) দেখে পাঠকরা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন। গান্ধীহত্যা সম্বন্ধে আমি কোন মতপ্রকাশ করি নি!পাঠকরা নিজেরাই করে নেবেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা,—"গান্ধীহত্যা", হত্যাকাণ্ডের পটভূমি বা কার্যকারণ,—কেন যে এতদিন আইন করে সাধারণ মানুষের সামনে প্রকাশ করতে দেওয়া হয় নি তা অবোধ্য---আমি শুধু ভাষান্তর করে বাংলা ভাষার পাঠকদের দিলাম!

আমি লেখক নই। কাজেই গুছিয়ে লিখতে পারি নি। যাঁদের ভালো লাগলো তাঁরা না লিখলেও, যাঁদের ভালো লাগলো না বা যাঁরা ভুলত্রুটি খুঁজে পেলেন তাঁরা লিখে জানালে খুশি হব!

অনেক বছর বাংলা সাহিত্যের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকায় ভাষান্তর করতে গিয়ে বাংলার সাথে মারাঠী মিশে এমন এক মিশ্রণ তৈরী হয়েছিল যা পাঠকদের হাতে পড়লে হয়তো হাসির খোরাক যোগাত। তার হাত থেকে বাঁচালেন বন্ধুবর শ্রী প্রনব দাস। সম্পূর্ণ অসুস্থ শরীর নিয়েও প্রচুর পরিশ্রম করে লেখাটাকে পাঠযোগ্য করেছেন, এককথায় বলতে গেলে অনুবাদক হিসাবে আমার নাম ছাপানো হলেও আসল কৃতিত্ব বন্ধুবর শ্রী প্রনব দাসের।

সবচেয়ে বেশী অভিনন্দন জানাই মহাজাতি প্রকাশনের শ্রী প্রকাশ চন্দ্র দত্তকে। যখন বামপন্থী নামধারী কিছু লোক সশস্ত্র বিপ্লবের বুলি আউরে অধিকার গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটী লোকের ছাতির উপর বসে কংগ্রেসের সেই পুরানো পুঁজিপতি ও মুনাফাখোর পোষনকারী ও মহাত্মা গান্ধীর 'মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির' পথই অনুসরণ করল সাথে সাথে হিন্দুত্বের নিন্দা ও বিরোধ করাই একমাত্র 'বৈপ্লবিক কাজ' হিসাবে বেছে নিল, আর মুসলমানদের খুশী করার জন্য সেই বামপন্থী (?) মন্ত্রীমণ্ডলে এমন লোককেও সমাবেশ করা হল যিনি সবসময় বলে বেড়ান, "প্রথমে আমি মুসলমান তারপর ভারতীয়", যখন হিন্দু শব্দ উচ্চারণ করাই অপরাধ সেই সময়ে, এই ধরনের পুস্তক প্রকাশ করার সাহস দেখিয়ে সত্যিই উনি প্রশংসনীয় কাজ করেছেন।

শান্তি দত্ত
স্পেশাল এগ্‌জিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট,
এ/৭ চোপরা চাওল, এল. বি. শাস্ত্রী, মার্গ
ভাণ্ডুপ, মুম্বই, ৪০০০৭৮

* (বম্বে শহরের আসল নাম মুম্বই)

আমার একমাত্র ইচ্ছা

"যার তীরে বসে প্রাচীন ঋষিগণ বেদ রচনা করেছেন—
সেই সিন্ধু নদী—
যেদিন আবার স্বাধীন ও অখণ্ড
হিন্দুস্থানের আধিপত্যে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবে—
সেই শুভদিনে আমার চিতাভস্ম, সেই সিন্ধু নদীতেই
যেন বিসর্জন করা হয়।"

—নাথুরাম

সূচীপত্র

एका निर्वासिताची कहाणी

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ग. त्र्यं. माडखोलकर

[illegible]

[illegible]

मूल्य पांच रुपये

[illegible]

प्रकाशक
ज्ञा. मा. घाचासुंदर, बी. ए.
टिळकरस्ता, नागपूर. नं २

एकमेव विक्रेते
श्री. रा. ज. देशमुख
देशमुख आणि कंपनी, पुणें

[illegible]

[illegible]

मुखपृष्ठावरील चित्रः— श्री. दीनानाथ दलाल

●●●

[illegible]

मुद्रक
ज्ञा. मा. घाचासुंदर, बी. ए
नरकेसरी प्रेस, नागपूर २

नागपूर, जून
१९४९

মূল মারাঠী বই 'একা নির্বাসিতাচী কহানী'-র পুস্তানি এবং টাইটেল পেজ। আম্বালা জেলে বসে ফাঁসির প্রাক মুহূর্তে কাগজের অভাবে এই পুস্তানি এবং টাইটেল পেজেই নাথুরাম গোড়সে এই চিঠি মাড়খোলকরজীকে লিখেছিলেন। এই চিঠির বাংলা অনুবাদ পরের পৃষ্ঠায় দেখুন।

নাথুরামের অন্তিমপত্র

আম্বালা জেলঃ—১৪/১১/৪৯

প্রিয় লেখক মহাশয়—

"নির্বাসিতের কাহিনী" পড়লাম। বিচারপূর্বক পড়লাম,আপনার লেখা মহারাষ্ট্রে এমনিতেই লোকপ্রিয়। আর এ কাহিনীর ঘটনা তো সত্য ঘটনা। তাই কাহিনীতে প্রেম, আবেগ, আদর, সন্তাপ, ঘৃণা, দুঃখ ইত্যাদি নানাবিধ ভাব অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আপনার মনের ব্যথা ও বিচার বিবেচনার ধারা আপনি বাস্তবিকতার আধারে বর্ণনা করেছেন।

শ্রীমান লেখক মহাশয়, আপনার নেতৃত্বে কোনও এক আন্দোলনের আমি পৃষ্ঠপোষক। আপনার সাধারণ সৌজন্যবোধের আমি গুনগ্রাহী, কিছুদিন আপনার প্রীতিপূর্ণ সুখসঙ্গের আস্বাদ পেয়েছি। আপনার উপর আমার ভালোবাসা আগে যেমন ছিল, আজও আপনার লেখা এই পুস্তক পড়বার পরও ঠিক তেমনি আছে। আর আমি এও জানি যে আমার সম্বন্ধে অত্যন্ত ঘৃণা ছাড়া আর কোন ভাবনা হয়তো আপনার মনে আজ অবশিষ্ট নেই।

কিন্তু তবুও আমি এ চিঠি আপনাকে লিখছি, আমার বিশ্বাস যে আপনি পড়বেন এবং বিচার করবেন। আমি আজ এই পত্র মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও তার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে লিখছি। আমার মন শান্ত ও স্বাভাবিক আছে। আমার মনে হয় আপনার এ কাহিনীর (নির্বাসিতের কাহিনী) পেছনে যেমন বাস্তব পটভূমি আছে, তেমনি আমার এই চিঠিরও এক অননুভূত ও ক্বচিৎ দৃষ্টি-গোচর এমন পটভূমি আছে। আমিও এক সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলাম। কিন্তু আমি সাহিত্যিক নই। তবে, সাহিত্যের সামান্য রসিক বলে আমি নিজেকে মনে করি। তাই আমার মনে হয় যে, যে পরিস্থিতিতে আমি এই পত্র লিখছি, তা একজন সাহিত্যিকের অন্তঃকরণ স্পর্শ না করে পারবে না!

আপনার এক "নির্বাসিতের কাহিনী"তে ঐ এক নির্বাসিত ছাড়াও আরও অনেক নির্বাসিতদের ব্যাপক ধ্বংস ও বিষাদের বর্ণনা আছে! একদিকে এই ধ্বংস ও বিষাদ আর অন্যদিকে গান্ধীবধ—যে গান্ধী ঐ ব্যাপক বিষাদের মূল কারণ!

গান্ধীবধ আপনার অন্তঃকরণে আঘাত করেছে, আপনার পৃষ্ঠপোষক ও অনুরাগীদের মধ্যেই একজন এই কাজ করেছে জেনে আপনার লজ্জা ও রাগ হয়েছে অপরিমিত।

উপরোক্ত ঘটনা যখন যখন আমি জানতে বা বুঝতে পারলাম আমার ভাবনাও তখন তখন কিছুটা আপনার মত হতে লাগলো। আপনি বিশ্বাস করুন কিংবা না করুন

আমি আসলে নিদয়ী মনোবৃত্তির মানুষ নই! সহৃদয়তা ও সার্ব্বিক সৌজন্য দিয়েই আমার স্বভাব গড়া। শুধু আমার বন্ধুবান্ধব কেন অনেক আরক্ষী অধিকারী ও কারারক্ষীদের কাছে খোঁজ করলেও তারা সাক্ষীপ্রমানসহ আমার উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা প্রমানিত করবে!

তাহলে আমি এই ভয়ঙ্কর কাজ করতে প্রবৃত্ত হলাম কেন? লেখক মহাশয়— এখানে আপনাকে অনুরোধ করছি কবির অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অথবা মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে আমার নিম্নলিখিত বক্তব্য পড়ুন তারপর না হয় ছুঁড়ে ফেলে দিন।

সহৃদয়তা, দয়া আর মহিলাদের প্রতি আন্তরিক মমতা ও শ্রদ্ধা—এই হচ্ছে, এই নিষ্ঠুর কাজের প্রেরণা। গণনিন্দা ও মৃত্যুদণ্ড এই দুই পরিনামই আমার ভাগ্যে আছে— এ জানা সত্ত্বেও উপরোক্ত ভাবনার কাছে তা আমার অতি তুচ্ছ মনে হল! ন্যায়ালয়ে দেওয়া আমার বক্তব্যের বেশীরভাগ অংশ, কিছু সত্য ঘটনা আর কিছুটা সাহিত্য কর্ম্ম। এসব সাধারণের সামনে রাখতে শাসনকর্তারা ভয় পায়। তাই এর প্রভাব আমি বুঝতে পারছি এই বক্তব্য যদি আপনি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেন তাহলে আমার ভাবনা আপনি স্পষ্ট বুঝতে পারবেন। আপনি বুঝতে পারবেন আমি এ কাজ করতে কেন উদ্যত হয়েছিলাম। আমার এ কাজের নিন্দা আপনি যতই করুন না কেন, আমার ভাবনার নিন্দা করা প্রাথমিক ভাবে আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না!

সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রেখে এবং নেতারা নিজেরা স্বসৃষ্ট অন্ধকারে থেকে দেশ ভাগ করলেন। গান্ধী যদি সত্যবাদী হতেন, তাহলে সবাই তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও, তিনি দেশবিভাগের বিরোধিতা করতেন। অথবা সাধারণ মানুষকে পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে তাদের মতামত নিয়ে তবেই তিনি দেশ বিভাগে স্বীকৃতি দিতেন। কিন্তু বিভাজনের পরেও, আমাদের আরাধ্য দেবী অখণ্ড ভারতমাতা খণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় নেতাকে শারিরীকভাবে আঘাত করার কল্পনাও আমার মনে স্থান পায় নি!

বিভাজনের পর ১৯৪৮ এর ২০শে জানুয়ারীর আগে আমি দুইবার দিল্লী ও পাঞ্জাবে ঘুরলাম, আর আমি সেখানে কি দেখলাম, সেই হৃদয়-বিদারক করুণ অমানুষিক ও বীভৎস প্রসঙ্গ আমার মনে হয় আমার চেয়ে আপনার লেখনী আরও ভালো ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতো—কারণ আপনার সাহিত্যিকের লেখনী!

তারপর আমার শেষবার দিল্লী যাওয়া ১৯৪৮-এর ১৭ই জানুয়ারী, মনে কিছু পরিকল্পনা ছিল কিন্তু তা ছিল অস্পষ্ট অসম্পূর্ণ, আমার এই দিল্লী বাসকালে তা স্পষ্ট হ'ল, নিশ্চিত হ'ল আমি বুঝলাম দুঃসাহসের মার্গ অবলম্বন করা ছাড়া এই মানবিক ক্রূরতা যা চরমসীমায় পৌঁছেছে, তাকে থামানোর আর কোন রাস্তা নেই!

গান্ধীর অন্তিম অনশন ছিল মুসলমানদের কাল্পনিক সমস্যার সমাধান করে তাদের পরিতৃপ্ত করা, হিন্দুদের উপর যে নিষ্ঠুর অত্যাচার শুরু থেকেই হচ্ছিল, দয়ার নামে তার

উপর ভয়ানক আঘাত করা হ'ল। গাছের তলায় থাকা সম্ভব হচ্ছিল না, তাই উদ্বাস্তুরা মন্দির ও মসজিদে আশ্রয় নিতে লাগলো, কিন্তু মসজিদে আশ্রয় হিসাবে বা শুধুমাত্র মানবজীবন রক্ষার জন্য ব্যবহার করার, গান্ধীজী প্রাণপণে বিরোধ করলেন! আর উদ্বাস্তুদের কোনরকমে আশ্রয়ের ব্যবস্থা না করে গান্ধীবাদী শাসনকর্তারা সহস্র উদ্বাস্তু—স্ত্রী-পুরুষ-শিশুদের ঐ প্রচণ্ড শীতের মধ্যে কোথাও বা নর্দমার পারে অথবা রাস্তার পাশে থাকতে বাধ্য করল। আর পঞ্চান্ন কোটী টাকা দাবী অনুযায়ী পাকিস্তানকে দান করল!

লেখক মহাশয়, একবার মনে মনে ভাবুন তো সেই সহস্রাধিক, সুশীলা অথচ লুণ্ঠিতা অত্যাচারীতা মহিলাদের মধ্যে আপনার নিজের ধর্মপত্নীও রয়েছেন? দেখবেন, এই চিন্তা একপলের বেশী আপনার মনে জায়গা পাবে না। তাহলে এই প্রকার অমানুষিক অত্যাচারী পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা তাদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য যে মানুষ হিন্দুস্থানের শাসকীয় কোষাগার থেকে প্রচুর অর্থ অনশনের ভয় দেখিয়ে দান করতে বাধ্য করে সেই মানুষ সম্বন্ধে আপনার মনোভাব কীরকম হবে! উপরোক্ত কথা ভাবনা বা কল্পনা নয়—এ হচ্ছে বাস্তব ঘটনা!

মুসলিম তুষ্টিকরণের জন্য প্রচণ্ড নিষ্ঠুর কাজকে উৎসাহ প্রদান, পাকিস্তানে হিন্দুদের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার, আর হিন্দুস্থানে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—এ সব গান্ধীর গোঁয়ার্তুমি ও মুসলমান তুষ্টিকরণ নীতির জন্যই হয়েছে। যতই কথার জাল বোনা হোক্ না কেন, আর নিজেদের পাপ ঢাকার জন্য, মাঝে মাঝে বৃটিশদের নামে গালি দেওয়া হোক্ না কেন, তবুও উপরোক্ত সত্য লুকানো যাবে না!

গান্ধীবাদ আর গান্ধীজীর মহানুভবতার নাম করে এমন সব আমাদের উপর চাপানো হচ্ছিল, যা আমাদের বিচারশক্তির ও সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত। হায়দ্রাবাদ সমস্যার সমাধান, রাষ্ট্রভাষার মত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, ইত্যাদি গান্ধীর গোঁয়ার্তুমির জন্য উর্দ্দুর বন্য ও বিপথগামী দায় হিন্দীর গলায় বেঁধে সমাধানের পর্যায়ে পৌছেছিল। তাই আরও ব্যাপক ভবিষ্যৎ অত্যাচার ও ভয়ানক ক্রূরতা থামাবার জন্য আমি স্বেচ্ছায় একটা নিষ্ঠুর কাজ করতে প্রবৃত্ত হলাম।

হিরোসিমায় পরমানু বোমা ফেলে এক পলের মধ্যে দেড়লাখ লোক যারা মারল সেই রাষ্ট্রের প্রসংশায় আমাদের 'অহিংস' রাষ্ট্র পঞ্চমুখ। আর এও বলা হয়, দেড়লাখ লোক মরল কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক বাঁচলো। তাহলে আমিও তাই বলছি যে গান্ধীজী মারা গেলো, আমরা কয়জন ফাঁসিতে প্রাণ দিচ্ছি, অনেককে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে, যাদের মধ্যে আপনিও একজন। কিন্তু দয়া ও সত্যের নামে যে ভয়ঙ্কর মানব-সংহার হচ্ছিল, হতে চলেছিল তৎক্ষনাৎ তা নিয়ন্ত্রিত হ'ল!

গান্ধীজীর রাষ্ট্রসেবার জন্য গান্ধীজীকে সহস্রপ্রণাম। কিন্তু রাষ্ট্র সেবকেরও রাষ্ট্রবিভাজনের ও রাষ্ট্র শত্রুকে সাহায্য করার অধিকার নেই! এই সমস্যা দেশের বা রাষ্ট্রের জনতাকে

বুঝিয়ে আর মত বিনিময় করে সমাধান করতে হয়! কয়েকজন নেতা লোকচক্ষুর অন্তরালে বসে কিংবা কোন মহাত্মা অনশনের ভয় দেখিয়ে এই ধরনের অনুচিত, বাধ্যতামূলক নীতি জনগণের উপর জোর করে চাপালে তার পরিনাম এই ধরনের বিস্ফোরণ ছাড়া আর কি হবে!

আমার অনুরোধ এই দেশের অভাগা লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের ও লুণ্ঠিতা, অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা মহিলাদের ব্যাপারে এক মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক কথা আপনি অবশ্যই লিখুন। আর সারা বিশ্বের সামনে স্পষ্ট করে এই সত্য তুলে ধরুন যে, এই ভয়ানক অমানবীয় কাজের জন্য দায়ী হচ্ছে গান্ধীবাদ। গান্ধীকে যত খুশি বন্দনা করুন, কিন্তু গান্ধীবাদের ফাঁদে রাষ্ট্রকে আর জড়িয়ে যেতে দেবেন না!

আজ গান্ধীবাদের মৃত্যু হচ্ছে। আমাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত, ন্যায়বিচার আর রাষ্ট্র শাসন ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী অহিংসা নীতির ব্যর্থতা সিদ্ধ করছে।

দয়ার ভিক্ষায় আমার জীবনদান করলে তা হত আমার আদর্শগত অস্তিত্বের মৃত্যু। কিন্তু আমার এই স্বর্গারোহণ গান্ধীজীর অহিংসাবাদের অবলুপ্তি ঘোষনা করছে। এ কাজ করে আমি কোনরকম পাপ করেছি, এরকম ভাবনা আমার মনে কোথাও স্থান পায়নি। তাই পাপস্খলনের প্রার্থনা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না! যদিও আপনি পঞ্চমহাপাতকের মালা (আপনার হিসাবে, শ্রীমদ্‌ভাগবৎ গীতার হিসাবে নয়) আমার জন্য তৈরী করেছেন, তাই আমি আপনার ভাবনায় আঘাত করতে চাই না। কিন্তু আপনার বিচারকে তথ্য জোগাতে চাই! পড়ুন, বিচার করুন, তারপর ইচ্ছে হলে ফেলে দিন! কিন্তু তবুও একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি এমন একজন লোক গান্ধী বধ করেছে যার অন্তঃকরন অন্ততপক্ষে আপনার চেয়ে কম সহৃদয় নয় এবং আপনার মতই যে সুসংস্কৃতি সম্পন্ন একথা বিশ্লেষণ আপনাকে করতে হবে।

গান্ধীজী অমর, কিন্তু গান্ধীবাদ আজ ক্ষয়প্রাপ্ত। হটকারী ও ভ্রমাত্মক তুষ্টিকরণ নীতির সামনে নত হওয়ার দিন শেষ হয়েছে। বুদ্ধিবাদের সূর্যোদয় হয়েছে।

আপনার

নাথুরাম বি. গোড়সে।

১৪/১১/৪৯

পুনঃ—প্রিয় মাড়্‌খোলকরজী—আমার অন্তিম নমস্কার স্বীকার করা বা না করা আপনার ইচ্ছা। স্বীকার করুন এই আমার অনুরোধ। আপনার এই কাহিনী প্রকাশ করতে যারা সাহায্য করেছেন, তাদের আমার ধন্যবাদ জানাবেন। গুরুপ্রতিম শ্রী আপ্পারাও কর্ভেকে আমার অন্তিম বিনম্র প্রনাম অবশ্য জানাবেন। আর অধিক কি লিখব? পরিস্থিতি

আমাকে এক নিষ্ঠুর কাজ করার প্রেরণা জুগিয়েছে। তাই "পরিস্থিতির" উপর আমি ক্ষুব্ধ, কাজের জন্য খেদ নেই, অন্তিম সময়ে আমার মন শান্ত আছে!

আপনার শুভেচ্ছু
নাথুরাম বি. গোড়সে
আম্বালা বন্দী গৃহ
১৪/১১/৪৯

পুনঃ—লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের জন্য এই কাহিনী অবশ্যই লিখুন আপনার লেখনী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, অন্তঃকরণ কোমল!

নাথুরাম।

গান্ধীহত্যার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসাবে মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণদের উপর অন্যবর্ণের লোকেরা অনেক প্রকার অত্যাচার করেছে, তাদের ঘরদোর পোড়ানো হয়েছে, অনেককে হত্যা করা হয়েছে। যে সব গ্রামে ব্রাহ্মণরা সংখ্যালঘু ছিল সেইসব গ্রাম থেকে তাদের উৎখাৎ করা হয়েছে! গান্ধীর হত্যাকারী একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কাজেই ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্য বর্ণের লোকেরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ব্যক্ত করতে গিয়ে এই ধরনের কাজ করেছে বলে প্রচার করা হয়, কিন্তু এ হচ্ছে এক ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচার, বাস্তব স্থিতি হচ্ছে এই যে মহারাষ্ট্রে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র ঘংঘর্ব চলছিল তাতে অংশগ্রহণ করেছিল প্রধানত মহারাষ্ট্রের ব্রাহ্মণগণ, তাঁরা অখণ্ড হিন্দুস্থানের স্বাধীনতার জন্য দৃঢ় সংকল্প ছিল এবং সেইভাবেই আন্দোলন চালাচ্ছিল, কংগ্রেস, মুসলিম তুষ্টীকরণ নীতির অনুসরণে দেশ বিভাজনের যে চেষ্টা চালাচ্ছিল, তাতে ঐ সংগ্রামী ব্রাহ্মণগণ তার প্রচণ্ড বিরোধ করল কিন্তু "বিভাজনের বিরোধ মানেই স্বাধীনতার বিরোধ" এই ধরনের প্রচার কংগ্রেসের নেতারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করতে লাগলো, যার পরিনাম-স্বরূপ সাধারণ মানুষের মন এই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে কলুষিত হতে লাগলো। অপরপক্ষে তারা গান্ধীকে দেবতা বলে মানতে লাগলো, তাই গান্ধীহত্যার পর মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণদের—অর্থাৎ কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিভাজননীতি-বিরোধী, অখণ্ড হিন্দস্থানের স্বাধীনতাকাঙ্খীদের গান্ধী হত্যার নাম করে যে অত্যাচার করা হল, তাই হচ্ছে সত্যিকারের গান্ধীবাদী দর্শন!

মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা সাহিত্যিক নাগপুরের "তরুণ ভারত" এর সম্পাদক শ্রী জি. টি. মাড়খোল্‌করও এই অত্যাচারের শিকার হয়ে কিছুদিন "নির্বাসিত" জীবনযাপন করেছিলেন। এবং সেই কাহিনী লিখেছিলেন পুস্তকরূপে, নাম দিয়েছিলেন "এক নির্বাসিতের কাহিনী" সেই পুস্তক নাথুরাম গোড়সে পড়েছিল, লেখককে মতামত জানাবার তার তীব্র ইচ্ছা ছিল, ফাঁসির আগের রাতে কাগজ আনিয়ে চিঠি লেখার মত সময় হাতে না থাকায় ঐ পুস্তকের ভিতরে যেখানে যেখানে ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেছে, সেখানে সেখানে তার মতামত লিখেছে। ফাঁসির কয়েক ঘন্টা আগে লেখা এই মতামত পত্র ফাঁসি হয়ে যাবার পর, সেই পুস্তক ও অন্যান্য জিনিস পত্র সম্বন্ধীয় বিভাগ থেকে ফেরত দেওয়া হল। তার ছোটভাই শ্রী দত্তাত্রয় সেই পুস্তক ও মতামত পত্রের এক অনুলিপি তৈরী করে ৮/১০ দিন পর শ্রী মাড়খোল্‌করের কাছে পৌছে দিল!

পুনের 'সোবৎ' সাপ্তাহিকের সম্পাদক শ্রী জি. বি. বেহেড়ে ১৯৭০ এর দীপাবলী সংখ্যায় তা প্রকাশ করলেন। ঐ পত্রের সাহিত্যিক রসগ্রহণের সাথে সাথে ভাবাত্মক রসগ্রহণও যেন পাঠক করতে পারেন—সেই উদ্দেশ্যে এই পত্র এখানে দেওয়া হল—

অনুবাদক

"A Nation that forgets it's History or it's Geography does so as it's peril"

"মূল গ্রন্থের প্রকাশকের বক্তব্য"

আমি রাজনীতিবিদ নই, কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্যও নই। কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রচারকও না! কাজেই এই পুস্তক প্রকাশনের পিছনে ঐ ধরনের কোন উদ্দেশ্য বা স্বার্থ আছে একথা কেউ বলতে পারবেন না! যা ঘটছে, তা ছাপানোর উপযুক্ত পাণ্ডুলিপির আকারে পেলে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা আমার পেশা। তবুও এই পুস্তক প্রকাশ না করার জন্য বন্ধু-বান্ধবরা পরামর্শ দিলেন। "পুরানো কাসুন্দী ঘেঁটে কি লাভ?"এ কথাও কেউ কেউ জিজ্ঞেসা করলেন, আমি শুধু এইটুকুই জবাব দিলাম ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্যই তাই। ইতিহাস অপ্রিয় হলেও তা লিপিবদ্ধ বা নথীভুক্ত করা ছাড়া উপায় কি?

এই পুস্তক কোনও দিন পাঠকের হাতে পৌঁছাবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। বিষয় উত্তেজনাপূর্ণ, রাষ্ট্রকর্তারা অসহিষ্ণু, এই অবস্থায় এক সর্বভারতীয় খ্যাতিসম্পন্ন নেতার হত্যাকারীর কথা ও কাহিনী ছাপাবার সাহস কে করবে?

আর সেই তথাকথিত অপরাধীও সামান্য অপরাধী নয়, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী, মহাত্মা গান্ধী সেই সময়ের শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আবার সাধু বা ত্যাগী পুরুষ হিসাবেও সাধারণের মধ্যে পরিচিত; এই ধরনের মানুষকে খুন। তাও আবার সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনা করে। বিবরণকারী গোপাল গোড়সে! হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মুখ্য আসামী। প্রত্যক্ষ হত্যাকারী নাথুরামের ছোট ভাই। উনিশ বছর কারাগৃহে কাটাবার পর সে তার নিজের বিশেষ করে গান্ধীহত্যা পরিকল্পনার কৈফিয়ত দিচ্ছে; কোনরকম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে!

গান্ধীর হত্যাকারী যদি কোন নিম্নশ্রেণীর সাধারণ অপরাধী হত বা মতলবী, আনাড়ী কিংবা বিকৃত মস্তিষ্কের লোক হত, তা হলে যারা গান্ধীর নাম ভাঙ্গিয়ে খায়, তারা ব্যথিত ক্রুদ্ধ হলেও এত গভীর রাজনৈতিক গুরুত্ব দিত না! গান্ধীবাদের কিংবা গান্ধীর চরিত্রে তাহলে দাগ পড়তো না! কিন্তু হত্যাকারী ও তাঁর সহযোগীরা সবাই ছিল সুশিক্ষিত, জ্ঞানী, সুবিবেচক এবং সবাই দেশভক্তও ছিল!

হ্যাঁ, সত্যিই এরা সবাই দেশভক্ত। এই দেশের উপরে যতটা প্রেম (?) গান্ধীর ছিল ততটাই প্রেম (সঠিক অর্থে) তাদের সবারও ছিল! শুধু তাই নয়, এই মাতৃভূমির প্রতি প্রেমের জন্যই গান্ধী হত্যার মত কাজ তাদের হাত দিয়ে ঘটেছে! সেই কাজের জন্য দায়ী অতীতের কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিশেষ করে গান্ধীজীর মুসলমান তোষণনীতি, যার পরিণতি হল দেশ বিভাগ, আর সাথে সাথে হাজার

হাজার সিন্ধি, পাঞ্জাবী, বাঙালী তথা ভারতীয়দের সর্বনাশ! গান্ধী হত্যা, কেবল এক সাধারণ খুন, এই দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে চলবে না। এ ছিল এক সুচিন্তিত রাজনৈতিক হত্যা! এই হত্যার পিছনে কোন ব্যক্তিগত স্বার্থ কিংবা ব্যক্তিগত লালসা ছিল না। ছিল ঐকান্তিক ও অসহায় দেশপ্রেম, ভাবাবেগের বশে হয়তো আনাড়ীর মতো এক বিভীষনী চক্রান্তকে বাধা দেবার প্রচেষ্টা। যারা খুন করলেন, তারা এ কথা বুঝলেন না যে খুন মানুষকে করা যায় তার আদর্শ বা নীতিকে নয়, তাই গান্ধীকে শেষ করা সম্ভব হল, কিন্তু গান্ধীবাদ? গান্ধীবাদ আপাতদৃষ্টিতে প্রসারলাভ করতেই থাকলো!

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা একথা বলতে পারি যে আজ গান্ধীবাদ ক্ষতবিক্ষত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় লাহোরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে শেষ প্রহর গুনছে! অহিংসা আর সত্যপথে চলার ঘোষণা (গান্ধীবাদ) অত্যন্ত করুণ অবস্থায় ভঙ্গুর থেকে ভঙ্গুরতম হয়ে সারা হিন্দুস্থানে ছড়িয়ে আছে! আর এই কয়েক বৎসরে স্বাধীনতা লাভ নরকলাভে পরিণত হয়েছে!

গান্ধীহত্যা আজ ইতিহাস। ইতিহাসে সত্য ছাড়া অন্য কিছুর স্থান নেই। এই গ্রন্থ সত্য সন্ধানের এক সামান্য প্রয়াসমাত্র! লেখকের আধিকার সীমাবদ্ধ একথা তাঁর জানা আছে, আমার প্রতিও আইনের বন্ধন আছে! তাই আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ একথা খেয়াল রাখতে হবে।

মাস পেরিয়ে বছর, বছর পেরিয়ে যুগ এবং যুগান্তর ঘটবে! নাথুরাম গোড়্‌সের নাম স্মৃতি থেকে মুছে যাবে! সাভরকরকেও দেশের মানুষ ভুলে যাবে! হয়তো আজকের দেবতুল্য গান্ধী, নেহেরুর নামও স্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যাবে! ভুলবার মতো পরিস্থিতিও তৈরী হবে ; কিন্তু এই ভূভাগ এইরকমই থাকবে! ভাবীকালের মানুষ ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো খুলে দেখবে, এই বৈভবশালী দেশ, কি করে কাদের দ্বারা, কখন, কেন টুকরো হল? সেই রাজনৈতিক নৃত্যনাট্যের প্রযোজক কে বা কারা? স্বার্থান্বেষী, এক বিশেষ ধর্ম্মের তোষণকারী, কাপুরুষোচিত রাজনীতির সে এক কলঙ্কিত অধ্যায়। তখন হয়তো সেই ভাবীকালের মানুষ প্রশ্ন করবে—

"বিস্তীর্ণ দুপারের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও
গঙ্গা-ও-গঙ্গা তুমি বইছো কেনো?
প্রাচীন ও সুমহান হিন্দু সভ্যতার রক্তাক্ত চিৎকার শুনেও
না পাক (অপবিত্র) ভূমির প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে একোন
নির্লজ্জ আয়াসে, সিন্ধু-ও-সিন্ধু
আজও তুমি বইছো কেন?"

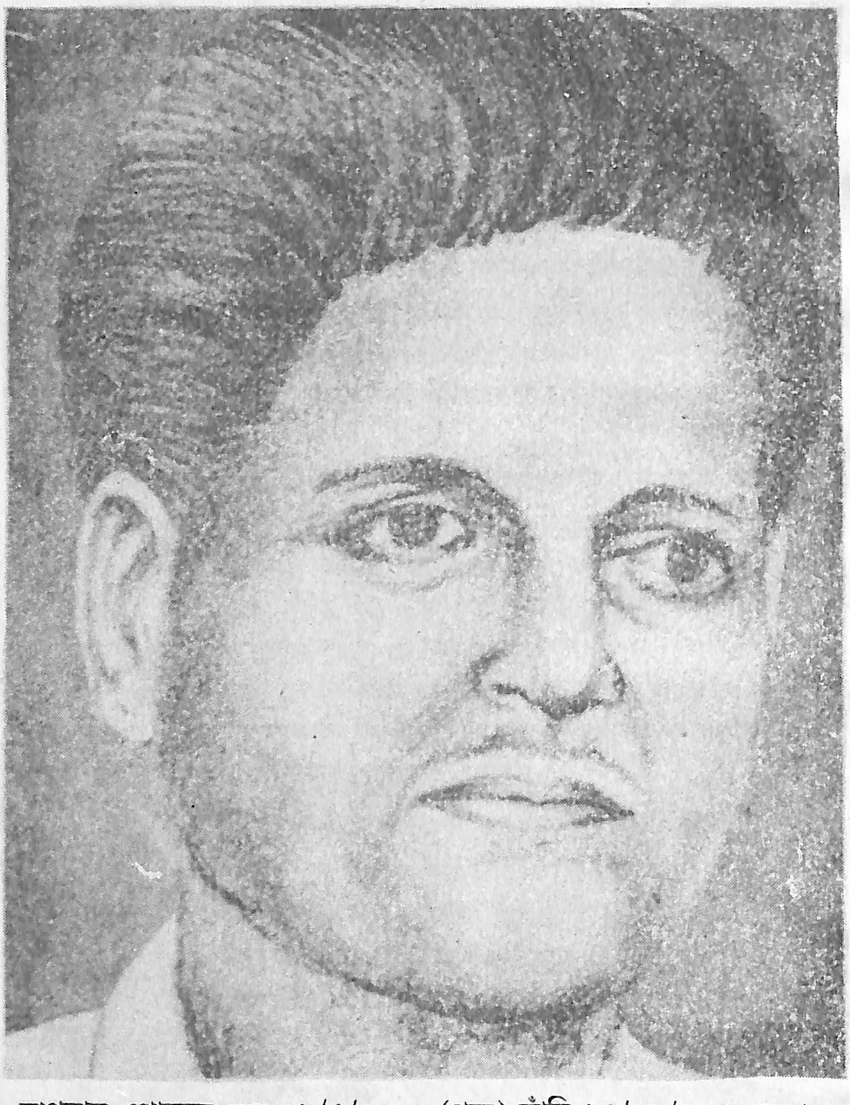
হয়তো সীমাহীন অশ্রদ্ধায় গান্ধী, নেহেরুর প্রসঙ্গ উঠবে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাভরকরের কথাতো অবশ্যই মনে পড়বে। ভাবীকালের ঐতিহাসিকদের নাথুরাম গোড়্‌সের মত সামান্য মানুষের কথা সামান্য সময়ের জন্য হলেও মনে পড়বে!

"মনুষ্য জাতিকে উন্নত করার অতি সরলীকৃত ও কৌশলহীন তত্বজ্ঞান ভুল জায়গায় ব্যবহার করলে দেশের মাটি রক্তে রাঙা হয়"—এই অভিজ্ঞতা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে, যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল দেবগিরির রামদেব রায়ের!

ভাবীকালের ঐতিহাসিকরা এদেশের আজকের ইতিহাস লিখবে, আর তাতে মৃত বৌদ্ধবাদের মতোই মৃত গান্ধীবাদের সমালোচনা করে কয়েক পৃষ্ঠা থাকবেই থাকবে!

কি জানি তখন নিয়তি কার ভাগ্যে কি রায় দেয়!

জি. ভি. বেহেরে!
("গান্ধী হত্যা আনি মী" পুস্তকের প্রকাশক,
'সোবৎ' সাপ্তাহিকের তৎকালীন সম্পাদক
ও খ্যাতনামা মারাঠী সাহিত্যিক)



নাথুরাম গোড্‌সে জন্ম ১৯/৫/১৯১০ (পুনে) ফাঁসি ১৫/১১/১৯৪৯-আম্বালা কারাগার



নারায়ণ আপ্টে ফাঁসি ১৫/১১/১৯৪৯ আম্বালা কারাগার



বিষ্ণু কারকারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মুক্তি ১৩/১০/১৯৬৪ পুনরায় গ্রেপ্তার
২৪/১১/১৯৬৪ পুনর্মুক্তি ৩০/১২/১৯৬৫ তিরোধান ৬/৪/১৯৭৪



গোপাল গোড্‌সে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মুক্তি ১৩/১০/১৯৬৪ পুনরায় গ্রেপ্তার ২৪/১১/১৯৬৪ পুনর্মুক্তি ৩০/১২/১৯৬৫

"প্রস্তাবনা"

আজ (১৯৯০ খ্রীষ্টাব্দে) আমার বয়স সত্তর বছর! অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অনেক পদে আমি কাজ করেছি! আমার স্ত্রী শ্রীমতি সিন্ধু সর্বদা আমার কাজে সহযোগিতা করছে! আজ আমি অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক!

হিন্দুস্থান স্বাধীন হল! হিন্দুস্থানের ভূমিতে মুসলমানেরা মুসলমান হিসাবে আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে পাকিস্তান নাম ধারণ করে স্বতন্ত্র হল! অবশিষ্ট হিন্দুস্থানে হিন্দুরা স্বতন্ত্রতা পেল না!

ইসলাম হচ্ছে এক রাজনৈতিক আক্রমণকারী পরধর্ম্ম অসহিষ্ণু বিস্তারবাদী আন্দোলন। যারা আল্লা মানে না, যাদের কোরানে বিশ্বাস নেই কিংবা মূর্তি পূজার মাধ্যমে উপাসনা করে, এমন নাগরিকদের দেশের উপর আক্রমণ করে তাদের পরাভূত করা, তাদের সম্পত্তি লুটপাট করা—তাদের মহিলাদের "লুট" হিসাবে সৈনিকদের দ্বারা বলাৎকার করানো, তাদের ধর্মান্তর করে মুসলমান করা, আর যারা ধর্মান্তরিত হলো না, তাদের উপর উপরোক্ত অত্যাচারের পুনরাবৃত্তি অবিরত চালু রাখা কোরানে এই শিক্ষা, হিন্দুস্থানে যখন থেকে ইসলামী আক্রমণের শুরু তখন থেকেই মসজিদগুলি থেকে দেওয়া হচ্ছে!

আজও খণ্ডিত হিন্দুস্থানের মসজিদ থেকে মুল্লারা সেই শিক্ষাই দিচ্ছে। আমাদের তথাকথিত ধর্ম-নিরপেক্ষ শাসনব্যবস্থা মুসলমানদের এই পরধর্ম্ম অসহিষ্ণুতা, ধর্ম্মীয় বিস্তারবাদ ও বিচ্ছিন্নতা বাদকে সতত অনুমোদন ও উৎসাহ দিচ্ছে। আর সাম্প্রদায়িক একতার জয়গান শুধু হিন্দুদের কানের কাছে গাইছে!

এইসব অশালীন কোলাহলে হিন্দুত্ব মানেই হিন্দু রাষ্ট্রীয়ত্ব, এই স্বতঃসিদ্ধ এবং বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের পথ প্রদর্শনকারী সংস্থার হয়ে জীবন ব্যয় করার জন্য কাউকেতো চাই, তাই আমি তার জন্য আছি; বুদ্ধিভ্রষ্ট স্বজনদের তিরষ্কার সহ্য করেও!

সাহিত্য থেকে সংস্কৃতি জন্মায়। আবার সংস্কৃতির আধারেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়! হিন্দুস্থান শাসন ইতিহাস বিকৃত করতে সচেষ্ট, সেই চেষ্টা নিশ্চিহ্ন করার কাজে "পঞ্চায়ন্ন কোটীন্‌চে বলি" (পঞ্চান্ন কোটীর বলি) "গান্ধী-হত্যা আনি মী", (গান্ধী হত্যা এবং আমি) এইসব পুস্তক সহায়ক হবে!

গোপাল গোড়সে

গান্ধীজীকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে সরানো ছাড়া, হিন্দু ও হিন্দুত্ব রক্ষা করার আর কোন উপায় নাই—আর হিংসা এবং অহিংসার তত্ত্বজ্ঞানের মানসিক দ্বিধা ছিলনা বলেই—এই রাজনৈতিক হত্যা কার্য্যকারী করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

গান্ধী হত্যা এড়ানো যেতো কিনা ?

কথিত আছে মানুষের জন্মলগ্নেই তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যলিপি লেখা হয়ে যায়, কিন্তু নিরন্তর সাধনা সত্ত্বেও ঐ লিপিপাঠের বিদ্যা মানুষের আজও আয়ত্তে আসেনি ! ভবিষ্যৎ জানার বিদ্যা অধিগত হওয়া সম্ভব হলে, মানুষ তার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়—প্রতিটি মুহূর্ত নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হতো। আর "ভাগ্য" "বিধির বিধান" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থই থাকতো না !

মৃত্যুতেই জীবনের সমাপ্তি ; একথা মানুষ ভালোভাবেই জানে, প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর কাল ও মার্গ বিধি নিশ্চিত করে রেখেছেন, সেই কাল ও মার্গ অবশ্যই তার কাছে অজ্ঞাত !

মানুষ তীব্র প্রচেষ্টাশীল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও মৃত্যুর কাল ও মার্গ, যথাক্রমে পিছিয়ে নেবার ও বন্ধ করার অবিরাম চেষ্টা মানুষ করে, কারণ মানুষ অস্তিত্ববাদী। অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের কামনায় মানুষ অনেক সময় অতিশয় বিপদশঙ্কুল পথও অবলম্বন করে। কোনরকম দুর্ঘটনা বা অঘটন ঘট্‌লে, তা কেন ঘটলো তা জানবার চেষ্টা করে আর ঐ ধরনের দুর্ঘটনা যেন ভবিষ্যতে না হয় তার জন্য নিজের নিজের সাধ্যমত চেষ্টা করে।

এই চেষ্টা বা উপায় প্রয়োগে ঐ দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বিশেষের কোন লাভ না হলেও সামগ্রিকভাবে মানব জাতির কল্যাণই সূচিত হয়, সেই দিকে নজর রেখেই, তা করা হয়। মৃত রুগীর মৃত্যুর কারণ তার শব পরীক্ষা করে পাওয়া যায় এবং সেই অভিজ্ঞতার প্রয়োগে অন্য রুগীর প্রয়োজনীয় সুচিকিৎসা করা সম্ভব হয়।

গান্ধী হত্যা এড়ানো যেতো কিনা, এ-বিষয়ে আলোচনা করে অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য যে শাসকীয় আরক্ষীদল নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের কর্তব্যে অবহেলা ছিল কিনা ? নাকি নিরাপত্তা ব্যবস্থার অন্য কোন ত্রুটি ছিল ? আলোচনার এই ছিল মুখ্য বিষয়। কিছুদিন আগেও এই কাজের জন্য পাঠক সমিতি (পরে কপুর আয়োগ) নিযুক্ত করা হয়েছিল।

আলোচ্য বিষয়কে তিনভাগে ভাগ করা যায়—প্রথমত তান্ত্রিক, দ্বিতীয় তাত্বিক ও তৃতীয় হচ্ছে দৈবিক। এখানে আমরা তান্ত্রিক বিষয়েই আলোচনা করব।

১৯৪৮ এর বিশে জানুয়ারী সন্ধ্যার সময় দিল্লির বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার কাছে বোমা বিস্ফোরণ হল, মদনলাল পাহোয়া ঘটনাস্থলেই ধরা পড়ল।

ন্যায়ালয়ে গান্ধী হত্যা অভিযোগ চলাকালে এমন প্রমাণ রাখা হয়েছিল যে মদললাল এ কাজ করবে বলে আগেই এমন লোকের কাছে প্রকাশ করেছিল, যিনি এই পরিকল্পনার সাথে যুক্ত নন !

শ্রী জগদীশ রুদ্র জৈন বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও. মুম্বই (বম্বে) বিশ্ববিদ্যালয়ের পী. এইচ. ডি. তিনি তখন রামনারায়ণ রুইয়া মহা বিদ্যালয়ের অর্ধ-মাগ্‌ধী ও হিন্দীর অধ্যাপক ছিলেন! তিনি কয়েকখানা পুস্তকও রচনা করেছেন। মদললাল ছিল উদ্বাস্তু। তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শ্রী জৈন তাকে ঐ পুস্তক বিক্রি করার জন্য শতকরা পঁচিশভাগ কমদামে দিতেন। দিল্লির লালকেল্লার ন্যায়ালয়ে — ৪-৪-৪৮ থেকে ৯-৮-৪৮ পর্যন্ত এই মর্ম্মে শ্রী জৈন তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছেন!

অধ্যাপক জৈন তাঁর সাক্ষ্যতে আরও বলেছেন "১৯৪৮ এর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে মদললাল আমার সাথে দেখা করেছিল। তার সাথে অন্য এক ব্যক্তিও ছিল। তার নাম "করকরে" বলে সে পরিচয় দিয়েছে...... । দুই তিনদিন পর রাত্রি আটটার সময় মদললাল আবার আমার কাছে এলো...... । কথা প্রসঙ্গে বলল যে তার দল (party) এক নেতাকে শেষ করে ফেলবার পরিকল্পনা করেছে। আমি সেই নেতার নাম জানতে চাইলে "আমি জানি না"—এই বলে সে প্রথমে এড়িয়ে যায়! আমি নাছোড়বান্দা হওয়ায় সে বলল "মহাত্মা গান্ধী" শুনে আমি অবাক এবং আতঙ্কিত হলাম। আমি ওকে এ ধরনের 'হঠ্‌কারী' কাজ করতে নিষেধ করলাম। 'ও' আমায় জানালো প্রার্থনা সভায় বিস্ফোরণ ঘটানোর দায়িত্ব ওর উপর ; তার ফলে হৈচৈ এর সৃষ্টি হবে, আর অন্যেরা গান্ধীজীকে ঘিরে ফেলবে। আমি তাকে নিবৃত্ত করার জন্য অনেক বোঝালাম। আমি এও বোঝালাম যে, সে উদ্বাস্তু আর পাঞ্জাবের দাঙ্গায় আগেই তার যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এবং আরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাছাড়া এ ধরনের হঠ্‌কারী কাজ করাও উচিত নয়! 'ও' চলে গেল, ওর কথায় আমি তখন খুব একটা গুরুত্ব দিলাম না, কারণ সেই সময় ঐ অঞ্চলের উদ্বাস্তুরা হামেশা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কটুক্তি ক'রে এধরনের কথা বলতো।"

"......কয়েকদিন পর মদললাল যখন আবার এলো তখন আমার উপদেশ গ্রাহ্য করেছে কিনা জানতে চাইলে সে বলল 'আপনি পিতৃতুল্য! আপনার উপদেশ না শুনলে আমার সর্ব্বনাশ হবে' আরও দুই এক দিন পর আবার যখন সে এল তখন সে দিল্লি যাচ্ছে বলে জানালো।"

"মদনলাল দিল্লি যাওয়ার সম্ভবত দুই তিন পর ঝেভিয়ার কলেজ হল-এ এক সভা আয়োজিত হয়েছিল। সেই সভায় শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের বক্তৃতা করবার কথা। আমি সভায় গেলাম। শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করলাম। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে মদললালের বক্তব্য বা উদ্দেশ্য তাঁকে জানাবার ইচ্ছা ছিল। কারণ তিনি দিল্লি যাবেন, আমার মনে হয়েছিল হয়তো দিল্লীর অধিকারীদের এ ব্যাপারে জানা থাকলে কাজে লাগবে। কিন্তু তাঁর (শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের) চারপাশে ভীড় থাকায় তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব হয়নি, কিন্তু তবুও দিল্লিতে কোন একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধছে, একথা তাঁকে জানাতে সক্ষম হয়েছি।"

"মদললাল, গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ও ধরা পড়েছে একথা যখন ২১-১-৪৮ তারিখে সংবাদ পত্রে পড়লাম তখন ঠিক করলাম যে পূর্বে নির্ধারিত সময় প্রার্থনা করে সর্দার প্যাটেলের সাথে দেখা করব। কিন্তু অসফল হলাম। শ্রী এস্.

কে. পাটীলের সাথে দেখা করার চেষ্টা করলাম ; কিন্তু তাতেও সফল হলাম না ! তারপর আমি দূরভাষের (টেলিফোনের) সাহায্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. জি. খের-এর সাথে সময় নির্দ্দিষ্ট করে বিকাল চারটের সময় সচিবালয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলাম ! মাননীয় গৃহমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন! মদনলাল সম্বন্ধে যা যা জানতাম সব তাঁদের জানালাম" (Criminal Appeals No 66 To 72 of 1949 East Punjab High Court Simla, Printed Record Vol-1 pages 130-138)

মুম্বই রাজ্যের তদানীন্তন গৃহমন্ত্রী মাননীয় শ্রী মোরারজী দেশাই এর সাক্ষ্য ২৩-৮-৪৮ থেকে ২৫-৮-৪৮ পর্যন্ত হয়েছে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে অধ্যাপক শ্রী জৈনের বক্তব্য সত্য বলে স্বীকার করেছেন। তিনি আরও জানালেন যে শ্রী জৈনের বক্তব্য শোনার পর আমি গুপ্তচর বিভাগের মুখ্য অধিকারী শ্রী নগরওয়ালাকে ডেকে পাঠালাম। কোন পূর্বনির্ধারিত কাজে ব্যস্ত থাকায় এবং সাথে সাথে আসতে না পারায় আমি তাঁকে যে করেই হোক 'বম্বে সেন্ট্রাল ষ্টেশনে' এসে দেখা করতে বললাম ; কারণ আমার 'অহমদাবাদ' যাওয়ার কথা ছিল ! শ্রী নগরওয়ালা রাত্রি সওয়া আটটার সময় ষ্টেশনে দেখা করলেন। আমি তাঁকে শ্রী জৈনের কাছ থেকে শোনা বৃত্তান্ত জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বললাম ! 'করকরে'-কে গ্রেপ্তার করতেও বললাম। আমি ২৩-১-৪৮ তারিখ সকালে অহমদাবাদ পৌঁছালাম, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সাথে দেখা করে অধ্যাপক জৈনের কাছ থেকে শোনা ঘটনা তাঁকে জানালাম, সে ব্যাপারে আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি তাও তাঁকে জানালাম।" (Printed Record Vol.-1 page 166-167)

শ্রী নগরওয়ালার সাক্ষ্য ৫-১০-৪৮ থেকে ১৮-১০-৪৮ পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে শ্রী মোরারজী দেশাই-এর বক্তব্যের সমর্থন করলেন। তিনি আরও জানালেন "দিল্লি পুলিশের ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট যশবন্ত সিং একজন সাব্ ইনেস্পেক্টারকে সাথে নিয়ে ২২-১-৪৮ তারিখে আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন, তিনি 'করকরে' ও অন্য পরিকল্পনাকারীদের গ্রেপ্তার করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। তাঁরা চলে গেলে আমি শ্রী করকরে ও তার সাথী, কেউ থাকলে তাদের অন্বেষণ করতে লাগলাম। তার আগে মুম্বই শহর আরক্ষী (পুলিশ) দলের কাছে শ্রী করকরেপরিচিত ছিল না ! কিছু সংবাদের ভিত্তিতে আমি ২৪-১-৪৮ তারিখে শ্রী বড়্গেকে গ্রেপ্তার করতে আদেশ দিলাম।" (Printed Record Vol.-1, page 278-293)

দিল্লীর ডেপুটি সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সর্দার যশবন্ত সিং এর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে ১৬-৯-৪৮ থেকে ২৯-৯-৪৮ পর্যন্ত। তাঁর সাক্ষ্য পরে গ্রহণ করা শ্রী নগরওয়ালার সাক্ষ্যের অংশবিশেষ অনুরূপ, বিড়লা ভবনের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন—১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর থেকে অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী সেখানে আসবার পর বিড়লা ভবনে কোন অঘটন যেন না ঘটে সেই উদ্দেশ্যে আরক্ষীদল নিযুক্ত করা হয়েছিল......। বিস্ফোরণের পর আরও কড়া পাহারা বসানো হল।......। সাদা পোষাকেও আরক্ষী অধিকারী নিযুক্ত করা হল। (Printed Record Vol.-1, page 239-247)

কেন্দ্রীয় শাসনের গুপ্তচর বিভাগের (গৃহ) অধিকারী শ্রী যশবন্ত সিং-এর সাক্ষ্য

১৪-৯-৪৮ ও ১৫-৯-৪৮-এ নেওয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন তখন অর্থাৎ ১৯৪৮-এর জানুয়ারীতে তুঘলক্ রোড পুলিশ ষ্টেশনের প্রধান (Incharge), বিড়লাভবন ছিল তাঁর পুলিশ ষ্টেশনের আওতায়। একজন হেড্ কনস্টেবল ও চারজন কনস্টেবল বিড়লা ভবনের প্রবেশপথে পাহারা দিত একথা তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে জানালেন। (Printed Record Vol.-1, page 283-298)।

উপরিউক্ত সাক্ষ্য প্রমান থেকে দেখা যায় যে, একটা পরিকল্পনা চলছে একথা অধ্যাপক জৈন বিস্ফোরণের আগেই জানতে পেরেছিলেন এবং তখনকার মুম্বই রাজ্যের গৃহমন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আরক্ষী প্রধান শ্রী নগরওয়ালা ও যশবন্ত সিংহ-এরা বোমা বিস্ফোরণের পর তা আরও বিশেষ করে জানতে পারলেন! মদললাল তখন বন্দী ছিল। সে এক বিস্তৃত বক্তব্য (Statement) আরক্ষীদের কাছে দিয়েছিল। তার বক্তব্য অনুযায়ী পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণকারী ব্যক্তিরা দিল্লীতে যেখানে যেখানে থেকেছে বা গিয়েছে, সেইসব জায়গায় আরক্ষী বাহিনীর লোকেরা অনুসন্ধান করেছে। মদললাল পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারীদের নাম না বললেও (শ্রী করকরে ছাড়া অন্যদের) তাদের বর্ণনা আরক্ষীরা জেনেছিল!

ন্যায়াধীশ শ্রী আত্মচরন ১০-২-৪৯ তারিখে তার রায় দিলেন। তিনি তাঁর রায়ে লিখেছেন যে ১৯৪৮-এর বিশে জানুয়ারী থেকে ত্রিশে জানুয়ারী পর্যন্ত অনুসন্ধান কাজে আরক্ষীদলের কর্তব্যে অবহেলা আমি কেন্দ্রীয় শাসনের গোচরে আনতে চাই। জানুয়ারী কুড়ি তারিখে মদললাল ধরা পড়ার পর সাথে সাথে দিল্লির আরক্ষীদল তার বিশদ বক্তব্য গ্রহণ করেছিল। মাননীয় গৃহমন্ত্রীকে ডাঃ জে. সি. জৈন যা জানিয়েছিলেন সে খবরও মুম্বই আরক্ষীদলের কাছে একুশে জানুয়ারী পৌঁছেছিল। অনতি বিলম্বে দিল্লি ও মুম্বই-এর আরক্ষীদল, তৎপর হতে না পারায় তাদের প্রতি বিরূপ হতেই হয়। (Yet the police miserably failed to derive any advantage from those two statements) এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার সামান্য কর্তব্যপরায়ণতা (Keenness) যদি দেখানো হত তাহলে হয়তো এই দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো যেতো। (Printed Record Vol.-III, pages 109)

ন্যায়াধীশ তাঁর সামনে উপস্থিত করা সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নাথুরাম ও আপ্‌টে পুনের আরক্ষীদলের কাছে বিশেষ পরিচিত ছিল, অহমদ্‌নগরের আরক্ষীদল করকরেকে চিনত। বিড়লা ভবনের আরক্ষীদলে পুনে ও অহমদ্‌নগরের আরক্ষীদলের কয়েকজনকে যদি সমাবেশ করা হত, তাহলে এই দুর্ঘটনা হওয়ার আগেই সম্বন্ধীয় ব্যক্তিদের ধরা হয়তো সম্ভব হত। সুরক্ষা ব্যবস্থা ও অনুসন্ধান কাজের ত্রুটি দূর করা হলে পরবর্তী দুর্ঘটনাও হয়তো এড়ানো যেতো, এই কথাই ন্যায়াধীশ বলতে চেয়েছেন বলে বোঝা যায়!

তবুও লক্ষ্য করার মতো যে, ন্যায়াধীশ লিখেছেন, এই দুঃখজনক ঘটনা "হয়তো এড়ানো যেতো," অর্থাৎ এই ধরনের প্রায় ত্রুটিমুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলে পরিকল্পনায় যুক্ত ব্যক্তিদের ধরা সম্ভব হত। আর তাহলে হয়তো এই পরিকল্পনাকারীদের অন্যতম লোকের হাতে গান্ধী হত্যা হত না! এই মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ বলে মানা যায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি

ধরা পড়তই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না কারণ, স্ব-প্রাণের বিনিময়ে একবার কোন আপাতদৃষ্টিতে অবৈধ কাজ করার সংকল্প যদি কেউ করে তাহলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব যাঁদের তারা জানতে পারলে সেই সংকল্প ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে, এই চিন্তা তার মনে থাকবেই, এমন সাবধানতা সে অবলম্বন করবে যাতে নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের হাজার চোখে ধুলো দেওয়া সম্ভব হয়! আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তখনকার মতো সে তার সঙ্কল্পিত কাজ স্থগিত রেখে যথাশীঘ্র এক নিশ্চিত পরিকল্পনা দ্বারা তার সঙ্কল্প সমাধান করবে!

উপরন্তু রয়েছে দৈবযোগ অথবা পরিস্থিতির অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা, নিজের সাবধানতা অসম্পূর্ণ বা নিখুঁত কিনা এই দ্বান্দিক চিন্তা তার মনে সবসময় থাকবে, অনেকসময় সাবধানতার জন্যে নয়, দৈবযোগেই কার্যসিদ্ধি হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দিল্লির আরক্ষীদল সেই রাত্রি থেকে যদি শুধু মুম্বই এর দিকে যাওয়া গাড়ীর উপর নজর না রেখে অন্যসব গাড়ীর উপরও নজর রাখতো বা অনুসন্ধান করত? সনাক্ত করার জন্য মদললাল সাথে ছিলই, তাহলে কানপুর যাওয়ার গাড়ীতে নাথুরাম ও আপ্‌টে অনায়াসে তাদের হাতে পড়ত। তাহলে পরের দুর্ঘটনা এ ব্যক্তিদের দ্বারা নাও হতে পারত, আর তারজন্য খ্যাতিমান হত আরক্ষীদল। কিন্তু দৈবযোগ আরক্ষীদলের অনুকূলে ছিল না!

পাঞ্জাব উচ্চ ন্যায়ালয় ২২-৬-৪৯ তারিখে রায় শোনালো। ন্যায়াধীশ ছিলেন তিনজন। সর্ব্বশ্রী ভাণ্ডারী, অচ্ছরুরাম ও খোসলা। পাঞ্জাবে উচ্চ ন্যায়ালয়, ন্যায়াধীশ শ্রী আত্মচরনের মতের সাথে সহমত নয় বলে মতপ্রকাশ করেছেন। ন্যায়াধীশ ভাণ্ডারী তা তাঁর রায়ে লিখেছেন।

স্ব-প্রাণের বিনিময়ে নাথুরাম, গান্ধীহত্যার সঙ্কল্প করেছিল। পিস্তল সহ বিড়লা ভবনে ঢুকে সে গুলিও করল! সেখানে সমবেত ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে ফেল্‌লে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা সে মনেও আনলো না (He did not care to run away), সে এক সঙ্কল্পিত বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিড়লাভবনে প্রবেশ করেছিল। বিশুদ্ধ সফলতাই ছিল তার একমাত্র কাম্য! যে কোনরকম সঙ্কটের মোকাবিলা করার ও তার জন্য যে কোন পরিনামের সম্মুখীন হওয়ার জন্য সে তৈরী ছিল। ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মনাম নিয়ে বিভিন্ন ঠিকানায় ঘুরে বেড়ানো, পরিনামের পরোয়া না করে বিশেষ উদ্দেশ্য প্রনোদিত কাজ করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প এক মানুষকে প্রতিহত করা আরক্ষীদলের পক্ষে সম্ভব ছিল কি? কিছু একটা ঘটতে চলছে আরক্ষীদল শুধু এইটুকু জানতে পেরেছিল ; কিন্তু কখন, কোথায়, আর কার দ্বারা, তা তাদের জানা ছিল না। তারা অন্ধকারে হাতড়াচ্ছিল, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছিল না! কি ঘটেছে তা, আজ আমরা জানি, আর তার উপর ভিত্তি করে আমরা একথাও বলতে পারি যে "এই অমূল্য জীবন হয়তো বাঁচানো যেতো", কিন্তু ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর বিজ্ঞতা বা বিচক্ষণতার অবতারণা খুব সহজ কাজ!

"........................ উপলব্ধ সাক্ষীপ্রমান থেকে আমি এই মত প্রকাশ করছি যে — (ক) ত্রিশ জানুয়ারীর আগে নাথুরামকে আটক করে গান্ধীজীর জীবন রক্ষা করা কেন সম্ভব হয়নি! এই বিষয় স্পষ্টিকরণ করার সুযোগ আরক্ষীদলকে দেওয়া হয়নি ; (খ) মদনলাল, গান্ধীহত্যা পরিকল্পনা কারীদের নাম আরক্ষীদল্‌কে জানায়নি। (গ) যদি

নাম জানান হত তাহলেও যে ব্যক্তি ছদ্মনামের আড়ালে, অনবরত স্থান পরিবর্তন করে স্ব-প্রাণের বিনিময়েও গান্ধীজীকে হত্যা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল, সেই নাথুরামকে ধরা অসম্ভব, নাহলেও প্রায় দুঃসাধ্য ছিল। (মুদ্রিত (Typed) বিষয়পত্র পৃষ্ঠা ১৯৫)

ন্যায়াধীশ শ্রী অচ্ছরুরাম লিখেছেন — "বিশ থেকে ত্রিশ জানুয়ারী ১৯৪৮ এই সময়ে আরক্ষীদল অনুসন্ধান কাজে শিথিল না হলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত" বিদ্বান ন্যায়াধীশ শ্রী আত্মচরণের এই মতের সমর্থন করার যোগ্য যুক্তি আমি কিছুই, পেলাম না। আর আমার মতে এই অভিমত সম্পূর্ণ অনাবশ্যক (Wholly uncalled for মুদ্রিত নির্ণয়পত্র পৃষ্ঠা ৫৫৯)

তৃতীয় ন্যায়াধীশ শ্রী খোসলা, ন্যায়াধীশ শ্রী আত্মচরনের মতের সাথে সহমত হয়ে রায় দিয়েছেন। তাই এই সমস্যার অনুমান নির্ভর সমাধান (Hypothetical) বিষয়ের তাত্ত্বিক বিচার করলে এই হত্যা এড়ানো যেতো এরকম কথা মানা যায়, আবার এড়ানো যেতো না একথাও বলা যায়। ধরে নেওয়া যাক্ নাথুরাম যদি ত্রিশ জানুয়ারীর আগেই মারা যেত তবে? সাক্ষ্য প্রমানের সাথে সম্বন্ধ নেই অথচ এমন এক ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে সুসংগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে গান্ধীজীর প্রাণ হয়তো রক্ষা হত!

বিশ-এ জানুয়ারীর দিনকয়েক আগে নাথুরাম ও নানা আপ্‌টে মোটর সাইকেলে মুম্বই থেকে পুনে আসছিল। নানা মোটর সাইকেল চালাচ্ছিল ; প্রচণ্ড শীত ছিল, তাই নানা উলের কানঢাকা টুপি পরেছিল। পার্ব্বত্য উঁচু নীচু পথের উচুঁতে আসার পর একসময় তার কানঢাকা টুপি চোখের উপর এসে পড়ল আর এমন ভাবে আটকে গেল যে একহাতে তা সরানো সম্ভব হল না! গাড়ী দ্রুতগতিতে চলছিল তাই থামাতে থামাতে অনেক আগে চলে গিয়ে ডানদিকে কাত হয়ে পড়ল! দুজনেই নিচে পড়ে গেল!

নাথুরাম পিছনে বসেছিল, কিন্তু কিছুই করতে পারছিল না।

তারা পড়ল একেবারে রাস্তার কিনারে, বাঁদিকে ছিল গভীর খাদ! রাস্তার কিনারা আর গাড়ীর চাকার ব্যবধান প্রায় ছিল না বললেই চলে। এছিল জীবন ও মৃত্যুর সীমারেখা! যদি গাড়ী বিপরীত দিকে অর্থাৎ বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ত তাহলে? তাহলে হয়ত পাঁচ সাত দিন পর কোন পথচারী বা স্থানীয় গ্রামবাসী, তাদের পচা বা অর্দ্ধপচা মৃতদেহ দেখতে পেত!

আমার মনে হয় যে একবার অসফল হবার পর সম্বন্ধীয় ব্যক্তির দ্বারাই গান্ধীহত্যার চেষ্টা আবার হবে এধরনের আশঙ্কা অধিকারীদের পক্ষে করা কঠিন ছিল! গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য আরক্ষীর সংখ্যাও প্রচুর পরিমানে বাড়ানো হয়েছে, গুরুতর ভুলের দরুন একজন ধরা পড়েছিল, অন্যদের ধরার চেষ্টা চলেছে, শাসনের হাত লম্বা তাই বাকিদেরও কয়েকদিনের মধ্যেই আটক করা হবে। সম্বন্ধীয় ব্যক্তি এতেই ভয় পেয়ে পুনঃপুনঃ চেষ্টা থেকে বিরত থাকবে, এই ধারণা হয়ত তারা করেছিল।

আগেই লিখেছি কার মৃত্যু কিভাবে, এবং কখন, তা মানুষের অজ্ঞাত বিধির-বিধানে, নাথুরাম ও আপ্‌টে, গান্ধীজীর মৃত্যুর নিমিত্ত হবে! আর, কোন অপঘাতে নয়! ফাঁসির দড়িতে 'মৃত্যু' এই ছিল নাথুরাম ও নানা আপ্‌টের বিধির লেখন!

কালায় তস্মৈ নমঃ

"যদি আমরা সবাই ধরা পড়তাম—
তাহলেও গান্ধীকে বাঁচানো যেতোনা—গান্ধী হত্যা হ'তই।"

"গান্ধী হত্যার পূর্বজ্ঞান আর উদাসীন নেতাগণ"

ন্যায়াধীশ কপুর তাঁর প্রতিবৃত্তে গান্ধীহত্যা হবে, এ বিষয়ে আগে থেকেই কে কে জানতে পেরেছিল এ-ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে শ্রী আত্মচরণের ন্যায়ালয়ে, অধ্যাপক শ্রী জে. সি. জৈন এই পরিকল্পনা সম্পর্কে মদনলাল তাঁকে কিছু বলেছিল একথা স্বীকার করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন আমার পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব ছিল আমি করেছি। বোম্বে রাজ্যের মুখ্য সচিবকে জানিয়েছি, শ্রী অশোক মেহতাকে জানিয়েছি, শ্রী জয়প্রকাশ নারায়ণকে জানিয়েছি আর হ্যারিশকে জানিয়েছি এছাড়া আমি আর কি করতে পারি? এদের মধ্যে কেউ কোন কিছু করার চেষ্টা করেনি— সে দোষ আমার নয়। ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তের দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃষ্ঠা ১-৭, অনুচ্ছেদ ২১-২১৭) লিখেছেন এই সাক্ষীর সাক্ষ্য অনুযায়ী গান্ধীজীকে বাঁচানোর ইচ্ছা কারও ছিল না! তিনি আরও লিখেছেন, যে ঘটনার অনুসন্ধান করা হচ্ছে, তার জন্য সাক্ষ্যের এই ভাগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ!

শ্রী 'যাজ্ঞিক' রামনারায়ণ রুইয়া কলেজের একজন অধ্যাপক, তিনি ছিলেন ২৯ নং সাক্ষী। শ্রী জৈন অধ্যাপক যাজ্ঞিককে একথা জানিয়েছিলেন, শুনে তিনি বিশ্বাসই করেননি! তবে শাসনকে (Government) এ বিষয়ে জানাবার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন।

এ থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে গান্ধীজীর প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। একথা অধ্যাপক জৈন জানতেন এবং তিনি তার বন্ধুবান্ধবদেরও জানিয়েছিলেন, তবে তাদের মধ্যে কেউ এখবর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন নি। কিংবা কোন গুরুত্ব দেননি। কিন্তু সমিতি এই মত প্রকাশ করেছেন যে শ্রী জৈন আরক্ষা অধিকারী মিঃ নগরওয়ালা কিংবা মিঃ ভারুচার কাছে না জানাতে পারলেও অন্তত মন্ত্রীদের অথবা কংগ্রেস নেতাদেরও জানাতে পারতেন। নয়তো চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটকেও জানাতে পারতেন। ন্যায়াধীশ কপুর তাঁর প্রতিবৃত্তের ১৭৯ পৃষ্ঠায় (অনুচ্ছেদ ২১-২২৯) এবিষয়ে উল্লেখ করেছেন (প্রার্থনাস্থলে বিস্ফোরনের পূর্বে শ্রী জৈন এর জানানো উচিত ছিল শ্রী কপুর এই কথা বলতে চাইছেন)

প্রথম খণ্ডের ২১০ পৃষ্ঠার (অনুচ্ছেদ ১৫-২৭৩/১১) ন্যায়াধীশ কপুর যে বিবরণ দিয়েছেন তার সারাংশ এইরকম—

স্বর্গীয় বালুকাকা কামিট্কর, তখনকার কৃষক-শ্রমিক (Peasent & Workers) পক্ষের নেতা আর. কে. খাদিলকর, স্বর্গীয় কেশবরাও জেধে (সংসদ সদস্য) এবং জি. বি. কেতকর এইসব সম্মানীয় ব্যক্তিরা পুনের পরিস্থিতি কিরকম বিস্ফোরক ছিল তা জানতেন। সংবাদপত্রের লেখা, সভা সমিতির ভাষণ, সাধারণ মানুষের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা এর মধ্যে দিয়েই কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতাদের, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু,

সর্দ্দার প্যাটেল ও মৌলানা আজাদ এদের প্রাণহানি হবার সম্ভাবনা প্রকাশ পেতো তা এঁরা বুঝতে পারতেন! এর মধ্যে শ্রী বালুকাকা কামিট্‌কর এবং শ্রী ভাগবত এরা দুজনেই তখনকার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি. জি. খের ও সর্দ্দার প্যাটেলকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু আরক্ষা অধিকারীকে জানাননি। ন্যায়াধীশ কাপুর আরও লিখেছেন যে আশ্চর্যের বিষয় এই যে এব্যাপারে কেউই গুপ্তচর বিভাগকে জানিয়ে সত্যমিথ্যা যাচাই করার চেষ্টা করেন নি!

ন্যায়াধীশ কপুর দ্বিতীয় খণ্ডে ১২৯-১৩০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে শ্রী কেশব রাও জেধে, গাড়্‌গীলকে (শ্রী এন. বি. গাড়্‌গীল, সাক্ষী নং ৬) যা জানিয়েছিলেন তার অতিরিক্ত গাড়্‌গীল কিছু জানতেন এমন কোন প্রমাণ তার সাক্ষ্যতে পাওয়া যাচ্ছে না! অথচ ১৩০ পৃষ্ঠার (অনুচ্ছেদ ২১-৩৫) বিবরণ এইরকম ঃ—

গাড়্‌গীল তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন; তিনি পুনের একজন নামকরা ব্যক্তি। ১৯৬৪ সালের ধনুর্ধারী পত্রিকার দীপাবলি সংখ্যায় যে লেখা তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি লিখেছেন—দেশ বিভাজনের জন্য পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দুদের কপালে যে দুর্ভোগ জুটলো সেইজন্য গান্ধীজীর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষুব্ধ হতে লাগলো। পুনেয় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে খোলাখুলিভাবেই কড়া সমালোচনা হতে লাগলো! পুনের সংবাদপত্র গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে অপ্রত্যক্ষ্যভাবে হিংসার পরিবেশ তৈরী করল! ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে চলেছে এ সংবাদ শোনা যাচ্ছিল! শ্রী বালুকাকা কামিট্‌কর, শ্রী খেরকে এক গোপন চিঠি পাঠালেন বলে শোনা গেল। সেই চিঠিতে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে কোনরকম ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে লিখলেন! সর্দ্দার প্যাটেল কখনও কখনও আশঙ্কা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁর কথার গুরুত্ব দেওয়া হত না, নেহেরু, হিন্দু নেতাদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত কড়া ভাষায় সমালোচনা করছিলেন। গাড়্‌গীল একথাও জানালেন যে হিন্দু উদ্বাস্তুদের মনে এই ধরনের ভাবনা ছিল যে গান্ধীজী তাদের জন্য কিছু করছেন না। অথচ মুসলমানদের সাহায্য করছেন। কারণ গান্ধীজী প্রত্যেকদিন প্রার্থনা সভার পর তাঁর ভাষণে শুধু হিন্দুদের কাজেরই সমালোচনার মাধ্যমে নিন্দা করতেন। অনেক উদ্বাস্তুদেরই তা অসহ্য মনে হত! তারা মনোক্ষুন্ন হতে লাগলো। অনেকে অতিশয় ক্ষুব্ধ হতে লাগলো! ৫৫ কোটী টাকা প্রদান তাদের কাছে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মত মনে হতে লাগলো! এই কারণে, যে, খুন হলো হিন্দুরা আর ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে মুসলমানরা। গান্ধীজী এবং নেহেরু হিন্দুদের বিরুদ্ধে "বিষোদ্‌গার" করতে লাগলেন। তাতেই গান্ধীবিরোধী তপ্ত বাতাবরণ দিন দিন আরও তপ্ত হতে লাগলো!

ন্যায়াধীশ কপুর তার মত প্রকাশ করেছেন যে শ্রী জেধের আসল বক্তব্য কি ছিল, শ্রী গাড়্‌গীলের তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মদনলালের স্বীকারোক্তি থেকে বোঝা যায় যে গাড়্‌গীল তা তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন নি। উদাসীনতা না দেখিয়ে তাঁর, বিচক্ষণ বুদ্ধি কাজে লাগানো উচিত ছিল। (পৃষ্ঠা ১৩২)।

এ থেকে বেঝা যায় যে কোথাও ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে—একথা উপর পর্যন্ত সবাই জানতেন। কিন্তু কি ভাবে? কোথায়?

তা জানতে পারলেও থামানো সম্ভব ছিল কি?

এই লেখক তাঁর সাক্ষ্যতে ন্যায়াধীশ কপুরকে বলেছিলেন যদি আমরা সবাই ধরা পড়তাম, তাহলেও গান্ধী হত্যা থামানো যেতো না।

“গান্ধীজীর রাষ্ট্রসেবার জন্য গান্ধীজীকে সহস্র প্রণাম। কিন্তু রাষ্ট্র সেবকেরও রাষ্ট্র-বিভাজনের ও রাষ্ট্রশত্রুকে সাহায্য করার অধিকার নেই”

—নাথুরাম

"গান্ধী হত্যার দিন"

"ডক্টর আমায় শারীরিকভাবে পরীক্ষা করুন। আমার হৃদয়, হৃদ্‌স্পন্দন ইত্যাদি সব স্বাভাবিক আছে কিনা তা নথিভুক্ত করে রাখুন"

গান্ধীহত্যার কিছুক্ষণ পর যখন নাথুরামকে পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তার আনা হল, তখন নাথুরাম ডাক্তারকে উপরোক্ত অনুরোধ করল। তার অনুরোধে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করলেন এবং তার হৃদয়, হৃদ্‌স্পন্দন, ইত্যাদি সব স্বাভাবিক আছে বলে নথিভুক্ত করলেন।

লালকেল্লার বিশেষ বন্দীগৃহে আমরা অভিযুক্তরা আলাপ আলোচনা করতাম। এই হত্যা পরিকল্পনার প্রত্যেক ঘটনার সাথে প্রত্যেক অভিযুক্তের সম্বন্ধ না থাকায় নিজের জানা নেই এমন ঘটনা সম্বন্ধে কৌতুহল হত। তাই ছিল আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু।

যে দিন যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হত তাতে উপস্থিত করা বিষয়, উপস্থিত না করা বিষয় ও এড়িয়ে যাওয়া বিষয়, এই নিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা হত, কোন সাক্ষীকে জেরা করতে হলে তাকে সম্ভাব্য কি কি প্রশ্ন করার জন্য আইনবিদ্‌কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে এই নিয়েও আলোচনা হত!

প্রত্যক্ষ ঘটনার সাথে সাক্ষীদের বক্তব্যের সত্যতা মিলিয়ে দেখতাম। অনেক সময় দেখা যেতো যে, সাক্ষী আসল, কিন্তু সে তার সাক্ষ্যতে অনেক মিথ্যা কথা বল্‌ছে, জেরা করে যেখানে যেখানে এই মিথ্যা ধরা পড়ত, ন্যায়াধীশ সেই অংশ অগ্রাহ্য করতেন ; কিন্তু জেরা করেও সবসময় সেই মিথ্যা ধরা পড়ত না, তখন কাগজপত্রে সেই মিথ্যাই সত্য বলে গ্রাহ্য হত!

আবার কখন কখন ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য কোন এক সাক্ষী দাঁড় করানো হত। সম্বন্ধিত ঘটনা সত্য, কিন্তু সাক্ষী ছদ্ম ; অতি কুশলভাবে ও সাবধানতার সাথে তৈরি এই ছদ্ম সাক্ষী যে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে তা প্রমান করা হত অসম্ভব। আমরা এই নিয়েও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতাম!

শাসন, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে, মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে, এই লেখাতে এরূপ অভিযোগ করা বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য নয়। সেই মকদ্দমা পুনঃবিচারের জন্য উপস্থিত করা কিংবা দণ্ডের পরিবর্তন,—এই বিষয় আজ কালবাহ্য ও ন্যায়দান পদ্ধতির আওতারও বাইরে। তাই মিথ্যা মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল একথা বলা অবাস্তব ও যুক্তিহীন। গান্ধীহত্যার সাথে জড়িত আসল সত্য

জানতে হলে কেবল বন্দীগৃহের বাইরে কাগজপত্র দেখে বা ন্যায়ালয়ের দলিল ও নথিপত্র থেকেও সম্পূর্ণ সত্য পাওয়া যাবে না! কারা প্রাচীরের ভেতরের আলোচনার কিছু অংশ জানতে পারলে ও ন্যায়ালয়ের নথীপত্রের সাথে মিলিয়ে তা থেকে সত্য জানার চেষ্টা পাঠক করতে পারেন। সত্যান্বেষনের জন্য শাসকীয় নথিপত্রের সাথে এই লেখার প্রতিপাদ্য বিষয়ও উপযোগী হবে বলে আমার মনে হয়!

কারা প্রাচীরের ভেতরে থাকাকালীন নাথুরাম ও নানা আপ্‌টের কথোপকথনের যে ভাগ মনে ছিল এবং যা এখনও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায় নি তার মধ্যে এক অংশ হচ্ছে নাথুরামের উপরিউক্ত বক্তব্য যা প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে।

গান্ধীহত্যার পর তার নামে লোকে অনেক কুৎসা, অনেক গুজব রটাবে তার মধ্যে বিকৃত মস্তিষ্ক, এই বিশেষণও থাকবে। এই কথা নাথুরাম ভেবেই রেখেছিল। নাথুরাম চাইছিল যে তার সে ধরনের কোন মানসিক রোগ বা মনবিকৃতি ছিল না একথা তখনই প্রমানিত ও নথিভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কোন মানসিক বিকারগ্রস্থ অবস্থায় এ কাজ করা হয়েছে বলে দয়া দেখানোর কোন সুযোগ যেন অভিযোগকারীরা না পায় এবং অভিযুক্ত পক্ষও যেন ঐ ধরনের অজুহাত নিয়ে দয়াভিক্ষা করার সুযোগ না পায়, এই ছিল তার ইচ্ছা, আর সেই জন্যই সে তার প্রকৃতি ঠিক আছে, ধমনী উত্তেজিত নেই তা পরীক্ষা করিয়ে লিখিয়ে রাখতে উৎসুক ছিল!

যাই হোক না কেন, এক চরম মানসিক অবস্থায় নাথুরাম এই তথাকথিত অবৈধ কাজ করেছে, একথা যে কোন লোক স্বীকার করবে। এই কাজের কোন স্বভাবগত মানসিক সমর্থন ছিল না। তা নাথুরামও জানতো। সে নিশ্চিত ছিল যে এই কাজের একমাত্র পরিনতি হল "ফাঁসী"!

এইরকম মানসিক অবস্থাতেও সাধারণ চিন্তাধারা তাঁর মন থেকে লোপ পায়নি। নিজের এই কাজের দরুন গান্ধী পরিবারের উপর যে আঘাত করা হবে এ খেয়াল তার ছিল। আর তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার সুযোগ গান্ধী-হত্যার একটু সময় পরেই সে পেয়েছিল।

গ্রেপ্তার করার পর নাথুরামকে কিছু সময় তুঘলক রোড আরক্ষী হাজতে (**Police Lock-up**) ও পরে পার্লামেন্ট স্ট্রীট আরক্ষী হাজতে রাখা হয়েছিল। অধিকারীদের সাথে অন্য কয়েকজন লোকও তাকে দেখবার জন্য এসেছিল। হাজতে পায়চারী করতে করতে নাথুরাম কখনও কখনও দরজার সামনে দাড়িয়ে পড়ছিল। ঠিক সেইসময় একজন লোকের সাথে তার চোখাচোখি হল। নাথুরাম দরজায় দাড়ালো—

"আমার মনে হয় আপনি শ্রীযুক্ত দেবদাস গান্ধী, তাই নয়" নাথুরাম প্রশ্ন করল!

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কি করে চিনলে"! সেই ভদ্রলোক প্রতিপ্রশ্ন করলেন। সভ্যতাবিহীন, হিংস্র বা ভয়ঙ্কর দর্শন কোন লোককে হাজতে দেখতে পাবেন এই কল্পনা করেই তিনি হয়তো এসেছিলেন। নাথুরামের কোমল অথচ স্পষ্ট শব্দ তার কল্পনার বাইরে ছিল!

"আমি আর আপনি কয়েকদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একত্রিত হয়েছিলাম। আপনি হিন্দুস্থান টাইমস্‌-এর সম্পাদক হিসাবে এসেছিলেন"

"আর তুমি"?

"আমি নাথুরাম বিনায়ক গোড্‌সে। দৈনিক হিন্দুরাষ্ট্র পত্রিকার সম্পাদক। আমিও সেখানে ছিলাম। আপনি আজ পিতৃহীন হলেন, আমিই তার জন্য দায়ী। আপনার ও আপনার পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর এই যে আঘাত হল তার জন্য সত্যিই আমি দুঃখিত। আপনি বিশ্বাস করুন কোনরকম ব্যক্তিগত শত্রুতা কিংবা ব্যক্তিগত আক্রোশ বা বিদ্বেষ অথবা আপনার বা আপনাদের পরিবারের কোনরকম ক্ষতি করব কেবল এই ইচ্ছা নিয়ে আমি এ কাজ করিনি"

যে হত্যাকারীর হাতের রক্ত এখনও শুকায়নি সেই লোক এত শান্তভাবে সমবেদনার কথা বলছে দেখে শ্রী দেবদাস গান্ধীর কৌতুহল বাড়লো। নিজের পিতৃহন্তার উপর ঘৃণা হলে তাতে অস্বাভাবিক কিছুই ছিল না। আর ঘৃণা হয়ে থাকলেও সাময়িকভাবে তা দূরে সরিয়ে রেখে পিতৃবিয়োগের দুঃখ কিছু সময়ের জন্য ভুলে গিয়ে তিনি নাথুরামকে প্রশ্ন করলেন "তাহলে তুমি এ কাজ করলে কেন?"

নাথুরাম জবাব দিল "এ বিষয় হচ্ছে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক, তা শুনবার জন্য আপনি আধা-পৌনে ঘন্টা সময় দিতে পারবেন কি? প্রয়োজনীয় অনুমতি নিন্‌। আপনি খবরের কাগজের সম্পাদক কাজেই পটভূমি সহজেই বুঝতে পারবেন"।

সাথের আরক্ষী অধিকারী দেবদাসকে বলল "কথা বলার প্রয়োজন নেই, চলুন যাই", একমাত্র গান্ধীজীর পুত্র বলেই তাঁকে দুই তিন মিনিট কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। শ্রী দেবদাস গান্ধী আরক্ষী অধিকারীর সাথে চলে গেলেন!

এই মকদ্দমার আশি (৮০) নম্বর প্রমান (Evidence) হচ্ছে একটা গুলির বহিরাবরণ। মহাত্মা গান্ধীর পুত্র শ্রী দেবদাস গান্ধী পিস্তলের একটা গুলির বহিরাবরণ হাতে দিলেন। তার উপর জি. ই. সি. ও. ১৯ এম. এম. কে. (GECO 19 MMK) অক্ষরগুলি মুদ্রিত আছে! তা নেওয়া হল। মোড়ক বানালাম। শাসকীয় মোহর লাগালাম। সাক্ষর জয়বন্ত সিং ডি. এস. পি. নিউ দিল্লী। সাক্ষী শ্রী দেবদাস গান্ধী, শ্রী ওংগন সিং লম্বরদার, তারিখ ৩১-১-৪৮ (মুদ্রিত বিবরণ Printed Record গ্রন্থ চার, পৃষ্ঠা ২৭)

উপরোক্ত প্রমান (Evidence) সিদ্ধ করার জন্য শ্রী দেবদাস গান্ধীকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়নি। শুধুমাত্র ওংগন সিংহের সাক্ষ্যই ১৬-৭-৪৮ তারিখে ন্যায়ালয়ে গ্রহণ করা হয়েছে (মুদ্রিত দলিল নং ১৪ পৃষ্ঠা ১৭৪) যদি শ্রী দেবদাস গান্ধীকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হত তাহলে তাঁর সাথে নাথুরামের যে কথোপকথন হয়েছিল তা, তাঁর সাক্ষ্য থেকেই উদ্ধৃত করা যেত।

গান্ধীজীর অন্যপুত্র শ্রী রামদাস গান্ধীকে লেখা প্রথম পত্রে নাথুরাম শ্রী দেবদাসের কাছে যেরকম ভাবনা ব্যক্ত করেছিল সেইরকম ভাবনাই ব্যক্ত করেছে!

১৯৪৯ এর জুন মাসের দুই তারিখে কারাপাল নাথুরামের হাতে এক পত্র দিল। শ্রী রামদাস গান্ধী ১৭-৫-৪৯ তারিখে নাগপুর থেকে ঐ পত্র পাঠিয়েছিলেন। চিঠির শুরুতে নাথুরামকে "প্রিয় নাথুরাম গোড্‌সে" সম্বোধন করে শ্রী রামদাস গান্ধী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—"যাঁর হত্যা করেছেন বলে আপনি নিজেকে হয়তো গৌরবান্বিত মনে করছেন, এই পত্রলেখক তাঁরই পুত্র।"

পত্র আবেগপূর্ণ, সেই পত্রের পরের অংশের অনুবাদ নিচে দেওয়া হল!

আমার বিশ্বাস আমার পিতার নশ্বর দেহেরই কেবল অন্ত করতে পেরেছেন, অন্য আর কিছুর নয়। এই কথা একদিন আপনি বুঝতে পারবেন, কারণ সারা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র এবং অসংখ্য মানুষ আমার পিতাকে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পন করেছে, তাতেই প্রমানিত হয়েছে যে শুধু আমার একারই নয় পৃথিবীর লক্ষাধিক লোকের হৃদয়ে আমার পিতার আদর্শের (Spirit) প্রভাব এখনও আছে!

আপনি জানেন বিশ্বের সমস্ত মানুষ আজ শান্তির জন্য আকুল। আনবিক শক্তি নয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া (Mutual Understanding) ও পরস্পরের সাথে প্রেম ও আদরপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি স্থাপন হবে, এ কথা যাঁরা বলেন এবং যাঁদের এ কথায় শ্রদ্ধা আছে তাঁদের মধ্যে এই যুগের শ্রেষ্ঠ সামরিক নায়কেরাও (Warlords) আছেন। তা দেখে হয়তো আপনি আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। এ দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের সেই ভাবনা "সত্য ও অহিংসা" এই সহজ ও অর্থপূর্ণ শব্দের মধ্যেই প্রকাশ পায়!

আপনার মন ও দৃষ্টি যে কুয়াশায় ও ভুল ধারনায় ঢেকে আছে তা দূর করতে উপরোক্ত বাস্তবস্থিতি আপনাকে সাহায্য করবে বলে আমার মনে হয়, এবং যখন সেই ভুল ধারনা দূর হবে তখন আপনার অনুশোচনা হবেই। আর যে কাজ আপনি করেছেন তা পুনরায় করা তো দূরের কথা বরঞ্চ সর্বকালেই ত্যাজ্য হওয়া উচিত, তা ধর্মীয় কারণেই হোক বা রাজনৈতিক কারণেই হোক একথা আপনি অবশ্যই উপলব্ধি করতে পারবেন, এতে আমার কোন সন্দেহ নেই। শুনেছি আপনি যুক্তি ও সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী (You are a man of reason and logic) তাই আমার অনুরোধ যে আমার উপরোক্ত বক্তব্য আপনি গভীরভাবে বিচার করবেন। আর তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি যে কাজ করেছেন তাতে আপনার অতিশয় প্রিয় যে কাজ অর্থাৎ দেশ সেবা তার কোন লাভ হয় নি!

আপনার

আর, এম, গান্ধী

পুনশ্চঃ আপনাকে জানাচ্ছি যে ১-৫-৪৯ তারিখে হিন্দুস্থানের বড়লাট্ (Governor General) কে পত্র পাঠিয়েছি, তাতে আপনাকে যে দণ্ড দেওয়া হয়েছে তা কেন বজায় থাকবে না তার কারণ লিখেছি!

পত্র পাওয়ার পরের দিনই অর্থাৎ তিন জুন ১৯৪৯, নাথুরাম তার জবাব লিখেছে ও নিয়মানুসারে সিমলার ডেপুটি কমিশনারের মারফত পাঠিয়ে দিয়েছে। তাতে রামদাস গান্ধীকে "স্নেহের ভাই" সম্বোধন করে সে তার মনোব্যথা প্রকাশ করেছে! নাথুরাম লিখেছে "আমার দ্বারা আপনার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের দুঃখজনক নিধন হল এবং তার দরুন আপনি ও আপনার আত্মীয়স্বজন যে মানসিক আঘাত পেয়েছেন সে বিষয়ে মানবতাবাদী হিসাবে সমবেদনা প্রকাশ করার মতো ভাষা আমার জানা নেই"। সেই পত্রের শেষে নাথুরাম আবার লিখেছে "আমার দ্বারা আপনার পিতার নিধনে আপনার ও আপনাদের যে মানসিক যন্ত্রনা সহ্য করতে হয়েছে তার জন্য আমি আবার গভীর দুঃখপ্রকাশ করছি!"

শ্রী রামদাস গান্ধীর পত্রের অন্য অংশের জবাবও এই পত্রে নাথুরাম দিয়েছে, এখানে তার আলোচনা যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে হয়!

বলা হয়ে থাকে গান্ধীজী কিছু তত্ত্ব বা নীতি ও সেই নীতি কার্যকরী করার জন্য কিছু নিয়ম বা প্রনালী প্রণয়ন করেছেন। আর এও বলা হয় যে গান্ধীজীর ভক্তরা তাঁর সেই প্রনালীরও পূজারী, শ্রী রামদাস গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী গান্ধীজীর নীতির প্রভাব তখনও জনমানসে ছিল এই অবস্থায় নাথুরামকে সহানুভূতি দেখানো তো দূরের কথা, অন্ততপক্ষে তার ভুলের উপলব্ধি যাতে হয় সেই উদ্দেশ্যেও ঐ ধরনের পত্র গান্ধীজীর শিষ্যদের কাছ থেকে আসা উচিত ছিল, কারণ রামদাস গান্ধীর বক্তব্য অনুযায়ী গান্ধীজীর পার্থিব দেহই শুধু বিনাশ হয়েছে, তাঁর মতাদর্শের নয়। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্যে একমাত্র রামদাস গান্ধীই নাথুরামকে পত্র পাঠিয়েছিলেন।

ভুলের উপলব্ধি করানো ন্যায়ালয় বা ন্যায়াধীশের কাজ নয়। তুমি অমুক কাজ করার জন্য অভিযুক্ত তা অমুক ধারা অনুযায়ী নিয়ম বিরুদ্ধ! এই বিধান দেওয়ার জন্যই ন্যায়ালয়।

নাথুরাম চাইছিল ন্যায়ালয়ের বাইরের কোন লোক তার বিশ্বাস যে ভ্রান্ত এই উপলব্ধি করাক, কারণ অস্ত্রধারী হিংস্র লোকদের মন পরিবর্তন করে, অহিংসক-এ পরিবর্তন করা ছিল গান্ধীজীর মতাদর্শের ভিত্তি। আর গান্ধীজীকে অনুসরণ করার মতো লোক হিন্দুস্থানে অনেক ছিল ! সাধারণ মানুষ এই কথাই জানতো! নাথুরামের তাত্ত্বিক ধ্যানধারনার বিষয়ে গ্রহণশক্তি প্রবল ছিল। যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আলোচনায় ছিল সক্ষম। তার মানসিক অবস্থাও ছিল শেষপর্যন্ত স্থির। ফাঁসির দণ্ডের বিরুদ্ধে একটুও অসন্তোষ প্রকাশ না করে সে নয়দিন ধরে উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজেই নিজের পক্ষ সমর্থন করে যুক্তি জাল বিস্তার করেছে। তার বিদ্যালয়ের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ছিল না। কিন্তু পড়াশুনা করার, গভীরভাবে চিন্তা করার ও বিবেচনা করার তার যে ঝোঁক বা আগ্রহ তাতেই তার বুদ্ধি পরিপক্ক হয়েছিল। ন্যায়াধীশ তাঁর রায়ে তার সম্বন্ধে লিখেছেন "যদিও প্রবেশিকা পরীক্ষায় সে উত্তীর্ণ হতে পারে নি তবুও তার জ্ঞান প্রচুর। এই ন্যায়ালয়ে নিজের যুক্তিজাল বিস্তার করতে সে ইংরাজী ভাষার উত্তম জ্ঞানের ও স্বচ্ছ বিচার ক্ষমতার উল্লেখযোগ্য প্রমান দিয়েছে ।"

(Although he did not succeed in passing the Matriculation Examination, he is quite widely read in arguing his appeal in this court. He displayed a very fair knowledge of English language and a remarkable capacity of clear thinking) (Cyclostyle Judgement page 206)

গান্ধী হত্যা যে হঠ্‌কারী বা অসংলগ্ন চিন্তা ভাবনার ফল, একথা সঠিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তাকে কেউ উপলব্ধি করাক বা প্রাথমিক সূত্র ধরিয়ে দিক, যাতে অন্ততপক্ষে একে অন্যকে বুঝবার মতো পরিস্থিতি তৈরী হয়। এই ছিল নাথুরামের ইচ্ছা, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজের সাথে একাত্ম হয়ে, কোন বিশেষ মানসিক চরম পর্যায়ে পৌছায়, তখন সেই ব্যক্তির ভয় বা প্রলোভন থাকে না। নাথুরাম যে বিশেষ মানসিক পর্যায়ে পৌছেছিল তার ব্যাখ্যা এখানে করছি না! বিশেষ ন্যায়াধীশ ১০-২-৪৯ তারিখে ফাঁসির আদেশ দেওয়ার পর "নাথুরাম" আর "মৃত্যু" ছিল মুখোমুখি। ফাঁসির ভয় কিংবা দয়াভিক্ষার কামনা বা অনুতাপ কোন কিছুই তার মনে স্থান পায় নি! সাময়িকভাবে মানসিক উত্তেজনার প্রভাবে কোন অন্যায় বা পাপ করার পর "কেন করলাম" এই চিন্তায় মন ভরে ওঠার নাম "অনুতাপ", কিন্তু মানসিক উত্তেজনাটা সাময়িক না হয়ে যদি আদর্শভিত্তিক হয় আর সম্পাদিত কাজটা আপাতদৃষ্টিতে অন্যায় মনে হলেও আসলে মহৎ, তাহলে যুক্তিতর্ক ও যথার্থ আলোচনা এবং সমালোচনার দ্বারা প্রমান করার প্রয়োজন যে মূল আদর্শটাই ভ্রান্ত, তাই সম্পাদিত কাজটাও অন্যায় বা পাপ ; কেবল তখনই ভুল বুঝতে পারার প্রক্রিয়া শুরু হয় আর এটাই "অনুতাপের" প্রাথমিক অধ্যায়!

আবার অনুতাপের ভাবনা আদর্শ ও নীতি-সম্ভুত এবং কামনা নিরপেক্ষ স্বার্থবিরহিত হওয়া প্রয়োজন "আমি অনুতপ্ত তাই আমাকে ক্ষমা কর" এতে রয়েছে স্বার্থ। আমার ধারণার বুনিয়াদের ভুল কেউ বুঝিয়ে দিলে অনুতাপ আমার অবশ্যই হবে, আর তা হলেও আমার দ্বারা সম্পাদিত কাজের কোন মার্জনা হবে না, হতে পারে না, তাই অনুতাপ করতে করতেই আমি আমার অবৈধ কাজের বৈধ সাজা ভোগ করব। এই ছিল নাথুরামের বিচার ধারা!

নাথুরাম নিজের কাজের ফলাফল সম্বন্ধে ঘটনার আগেই সচেতন ছিল, তাই সুযোগ পেতেই সে তার মনোবেদনা গান্ধী পরিবারের সদস্যের সামনে প্রকাশ করেছে। মনে, এক কোনে তা এত দৃঢ়ভাবে গেঁথে ছিল যে—"কর্তুমেচ্ছসি যন্মোহাত করিষ্যস্যয় শোপিতত" এই কথাই যেন তার অন্তরাত্মা তাঁকে বলছিল। তার ধারণার ভিত্তির উপর সে অটল থাকায় শ্রী রামদাস গান্ধীর ব্যক্ত করা সদ্‌ভাবনার সিঁড়ি বেয়ে ফাঁসি-মঞ্চ থেকে নেমে আসার মোহও তার হয়নি। গান্ধীজীর এমন এক শিষ্যের সাথে তার আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল, যিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নয় বা যাঁরা ক্ষমতাবান তাঁদের যিনি প্রভাবিত করতে পারবেন না, কারণ তাহলে তাঁর কাছ থেকে কিছু চাওয়ার বা আশা করার প্রশ্নও উঠবে না! নাথুরাম শ্রী রামদাস গান্ধীকে যে পত্র লিখেছিল তার অনুবাদ এইরকম—

সিমলা

স্নেহের ভাই,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　৩ জুন, ১৯৪৯

রামদাস গান্ধী

আপনার সতেরোই মে'র সহৃদয়পূর্ণ পত্র কাল পেলাম। আমার দ্বারা আপনার পরম পূজনীয় পিতৃদেবের শোচনীয় মৃত্যু হল আর তার জন্য আপনার ও আপনার আত্মীয়দের যে মানসিক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে সে ব্যাপারে আমার ভাবনা ব্যক্ত করার মতো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। তবুও আমার মনে হয় এর অন্য একদিকও লক্ষ্য করা প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার সমস্ত বক্তব্য লিখিতরূপে উপস্থিত করা সম্ভব নয় এবং আপনার সাথে দেখা করাও আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার ফাঁসির পূর্বে কারাগারে আমার সাথে দেখা করা আপনার পক্ষে নিশ্চয়ই সম্ভব হবে!

আপনি লিখেছেন, আপনি শুনেছেন যে আমি একজন যুক্তিবাদী মানুষ। কিন্তু আপনি জানলে হয়তো আশ্চর্যান্বিত হবেন যে আমি একজন প্রখর সংবেদনশীল মানুষও বটে। আর আমার সেই সংবেদনশীলতার সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে মাতৃভূমির উপর নির্ভেজাল ও নিরবিচ্ছিন্ন শ্রদ্ধা!

আপনি লিখেছেন যে একবার আমার মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে পারলে আমার অনুতাপ হবে, ও আমার অপরাধ আমি বুঝতে পারবো।

ভাই, আমার মন উন্মুক্ত করে আমি বিচার গ্রহণে ইচ্ছুক (I am an open minded man) আর ভুল সংশোধনের জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত। কিন্তু আমার যদি কোন ভ্রান্ত আদর্শ থাকে, তা দূর করে আমার মধ্যে অনুশোচনা বোধ জাগিয়ে তোলার পথ কি?

"ফাঁসির মঞ্চ"—নিশ্চয়ই নয়, আর অনুগ্রহ করে গুরু অপরাধে লঘু দণ্ড দেওয়াও (Commutation) নয়। আমার সাথে দেখা করা আর দেখা করে আমার ভুল আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া এই হচ্ছে একমাত্র পথ। অনুতাপ করার মতো কিছু অন্তত এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি না!

কতিপয় খ্যাতিমান খৃষ্টীয় ধর্মপ্রচারক আমায় অনেক চিঠি পাঠিয়েছেন! তাঁদের পবিত্র বাইবেলের শিক্ষা অনুযায়ী তাঁরা আমাকে কিছু উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু আপনারই প্রথম পত্র যা আপনার পিতার সুবিদিত তত্ত্বের সাথে কিছুটা সামঞ্জস্য রাখে। সত্যিই এ আশ্চর্যজনক। আমার নামে অনেক চিঠি এসেছে, যা অশ্রাব্য কথায় ভরা! আমার মনে হয় না যে এ ধরনের চিঠি আপনার পিতার কোন অনুরাগীরা লিখেছেন!

যাইহোক্ আমার অনুরোধ আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করুন, সম্ভব হলে আপনার পিতার কোন অন্যতম প্রধান অনুরাগীকে সাথে নিয়ে সাক্ষাৎ করুন ; বিশেষ করে এমন অনুরাগী, যিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নন। আর সেই সাক্ষাৎকারে আমাকে আমার প্রমাদ দেখিয়ে দিন!

না হলে আমি বুঝবো যে আমার প্রতি এই অনুকম্পা মিথ্যাচার (Eye wash) ছাড়া আর কিছুই নয়!

আপনি যদি আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করেন, সেই আলোচনা ভাবনাত্মক আলোচনা হোক কিংবা বিধিসম্মত তর্কই হোক, কে বলতে পারে, হয়তো আপনি আমার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন, আর আমার মনে অনুশোচনাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারবেন। কিংবা আমি আপনার মধ্যে পরিবর্তন ঘটাবো আর আমার বক্তব্য সম্বন্ধে আপনার মনে দৃঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করব। কিন্তু শর্ত একটা—তা হচ্ছে এই, যে, আমাদের আলোচনা হবে সম্পূর্ণ সত্যের উপর অধিষ্ঠিত!

আমার হাতে আপনার পিতার নিধন হওয়ায় আপনার ও আপনাদের যে অপূরনীয় ক্ষতি হয়েছে তার জন্য আমি পুনরায় গভীর দুঃখপ্রকাশ করছি!

আপনার শুভাকাঙ্খী

নাথুরাম, বি, গোড্‌সে।

পুনশ্চ ঃ আপনি যদি উচিত মনে করেন তাহলে এই পত্রের প্রতিলিপি ভারতের বড়লাট্ (Governor General) কে পাঠাবেন!

উপরে উল্লিখিত দুটি পত্রের পরেও আরও পত্রালাপ হয়েছে, তাৎপর্য এই যে আচার্য বিনোবাভাবে ও কিশোরীলাল মশ্রুয়ালা এঁদের সাথে নিয়ে নাথুরামের সাথে দেখা করার জন্য রামদাস গান্ধী চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি, কেন সফল হয়নি তার আলোচনা আমি এখানে করছি না। কিন্তু সাক্ষাৎকার হল না, এটাই ঘটনা। এই সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়েই হয়তো ফাঁসির আগে নাথুরামের হৃদয় পরিবর্তন হতে পারতো, আর আজকের নতুন বংশধরদের সামনে রাখা যেতো যে গান্ধীবাদ হচ্ছে এক সিদ্ধান্তগত যুক্তিবাদী ও কার্যকারী পথ!

যাইহোক রামদাস গান্ধীর পত্রে নাথুরাম এইজন্য খুশি হয়েছিল, মানসিক বিকৃতির জন্য মানুষ পাগল বলে গণ্য হয়। তাকে সেইরকম কিছু ভাবা হয়নি, বরং একজন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ হিসাবেই ভাবা হয়েছিল।

গান্ধী হত্যার দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নাথুরাম স্ব-ইচ্ছায় ফাঁসির আসামী হয়েছে। ঐ হত্যাকাণ্ডের কিছু আগের ও পরের পরিস্থিতি এখানে আমরা আলোচনা করব।

নাথুরামের ৩০৬৮-২৪ এই নম্বরের একটা স্বয়ংক্রিয় পিস্তলে সাতটা গুলি ভরা ছিল। সাধারণ পিস্তলে (যা স্বয়ংক্রিয় নয় এমন) প্রত্যেকটা গুলি ছাড়বার জন্য প্রত্যেকবার ঘোড়া টানতে হয়। কিন্তু স্বয়ংচালিত পিস্তলের ঘোড়া একবার টানলেই সব গুলি একটার পর একটা খুব দ্রুতগতিতে বেরিয়ে যায়। ঘোড়া টেনে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেও অন্ততপক্ষে দুটি বেরিয়ে যাবেই!

নাথুরাম ঘোড়া একবার টেনেই তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। সে জানতো দুটি গুলিই বেরিয়েছে, পরে জানতে পারলো তিনটে গুলি বেরিয়েছে। এত দ্রুতগতিতে গুলি বেরিয়ে গেলেও প্রত্যেকটা গুলি ছুটবার শব্দও ভিন্ন ভিন্ন হবে এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু একটা গুলির শব্দের সাথে আর একটা গুলির শব্দের ব্যবধান করা মনে মনেই সম্ভব।

মৌখিকভাবে উচ্চারণ করাও সম্ভব নয়, কারণ উচ্চারণ যত তাড়াতাড়ি করা হোক না কেন গুলি ছুটবার বেগের চেয়ে উচ্চারণের বেগ মন্দ হবেই, উৎসুকতা থাকলে যে কোন ব্যক্তি উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

কয়েকজন সাক্ষীর বক্তব্য শুনে মনে হয় যে সেই তিনটা গুলি একটার পর একটা থেমে থেমে বা আস্তে আস্তে বেরিয়েছিল। "আমি খুব ক্ষিপ্রগতিতে ও সতর্কতার সহিত নাথুরামকে ধরেছি" একথা কয়েকজন সাক্ষী বলেছে।

"আমি সবার আগে নাথুরামকে ধরেছি" একথা তো বেশিরভাগ সাক্ষীই বলেছে!

পুলিশ ইন্সপেক্টর শ্রী অমর নাথের সাক্ষ্য ৯-৬-৪৮ তারিখে বিশেষ ন্যায়ালয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি ছিলেন বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর নিরাপত্তার জন্য নিযুক্ত বাহিনীর প্রধান। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন—"আমি তখন গান্ধীজীর বাঁদিকে আড়াই তিন পা পেছনে ছিলাম। আমি গুলির একটা আওয়াজ শুনলাম আর সাথে সাথে ধোঁয়া দেখতে পেলাম। আমার মনে হল কেউ গুলি ছুঁড়ছে। তখন আমি এগিয়ে গেলাম ও যে গুলি ছুঁড়ছিল তাকে ধরলাম। ইতিমধ্যে তিনটা গুলি ছোঁড়া হয়ে গিয়েছিল এবং সব গুলিই মহাত্মা গান্ধীর লেগেছিল। ভিড়ের মধ্যে থেকে সার্জেন্ট দেবরাজ সিংও এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি আক্রমণকারীর হাতের কব্জি ধরলেন ও রিভালবার কেড়ে নিলেন। রিভালবার দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিল। আক্রমণকারী গান্ধীজীর থেকে প্রায় আড়াই পা দূরে ছিল"

ত্রিশ জানুয়ারীর ঘটনার এই ছিল প্রথম সাক্ষী। সাক্ষ্য শেষ হওয়ার সাথে সাথে জেরা করার উদ্দেশ্যে নাথুরামের আইনবিদ্ শ্রী ভি ভি. ওক্ নাথুরামের দিকে তাকাল। আইনবিদ্-এর মাধ্যমে নাথুরাম ন্যায়ালয়কে নিবেদন করল—ত্রিশ জানুয়ারীর ঘটনা সম্বন্ধে অভিযোগকারীরা যে সাক্ষীদের দাঁড় করাবে তাদের জেরা করবার তার ইচ্ছা নেই। ন্যায়মূর্ত্তি নাথুরামকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন কারণ 'আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ দেওয়া হয়নি' এধরনের অভিযোগ যেন না আসে। নাথুরাম পুনরায় ঐ জবাবই দিল।

শ্রী নন্দলাল মেহতা ছিলেন দিল্লির এক ব্যবসায়ী। সেদিন তিনি বিড়লাভবনে ছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য নেওয়া হল ২-৮-৪৮ তারিখে। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন—'গান্ধীজী নিজের কক্ষ থেকে দশ বারোজন অনুগামী সমেত প্রার্থনাস্থলের দিকে যাচ্ছিলেন। তার মধ্যে আমিও ছিলাম! আমি পর পর দুই তিনটা গুলির শব্দ শুনলাম, এবং সামনের দিকে লাফ দিলাম। আক্রমণকারীর হাত ধরলাম। তার হাতে পিস্তল ছিল। প্রায় তৎক্ষনাৎ তিন চারজন এসে আক্রমণকারীকে ধরে ফেলল!'

শ্রী নন্দলালজী তাঁর সাক্ষ্য পরে পরিবর্তন করলেন, তিনি বললেন "আমি আক্রমণকারীকে ধরার আগেই তিন চারজন তাকে ধরেছিল"।

জেরা করা হয়নি!

ফুট কনস্টেবল রতন সিং এর সাক্ষ্যও সেইদিন নেওয়া হয়েছে! বিড়লা ভবনে যে প্রতিরক্ষা দল নিযুক্ত করা হয়েছিল, সে ছিল তাদের একজন। সে তার সাক্ষ্যতে বলল

"আমি পর পর দুই তিনটা গুলির শব্দ শুনলাম, আর সেই দিকে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম যে অমনরনাথ, ধরম সিং ও এক সৈনিক অধিকারী আক্রমণকারীকে ধরে ফেলেছে।"

ন্যায়ালয় রতন সিংকে এক প্রশ্ন করলে তার জবাব দিতে গিয়ে সে নাথুরাম ও আপ্‌টে এদের দুজনকে দেখিয়ে বলল "ত্রিশ জানুয়ারী এদের মধ্যে একজনকে ধরা হয়েছিল, কিন্তু সঠিক কাকে, এ আমি খেয়াল করতে পারছি না!"

হেড কনসটেবল শ্রী ধরম সিং (নম্বর ১৫৭৬), ৯-৭-৪৮ তারিখে তার সাক্ষ্যতে বলল—"আমি সেই দিন প্রার্থনাস্থলে পাহারারত ছিলাম, আমি একটা গুলির আওয়াজ শুনে সেইদিকে এগোলাম, এরই মধ্যে আরও দুইটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। পিস্তল হাতে একজন লোককে আমি দেখতে পেলাম। আমি তার ডান হাত, মানে যে হাতে পিস্তল ছিল, সেই হাত ধরলাম, সেইসময় একজন সৈনিক এগিয়ে এল। সে আক্রমণকারীর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিল। আক্রমণকারী গান্ধীজী থেকে দেড় ফুট দূরে ছিল!"

শ্রী রঘুনাথ নাইক ছিল বিড়লা ভবনের মালী। তার সাক্ষ্য নেওয়া হল ২০-৮-৪৮ তারিখে। তার সাক্ষ্য এইরকম—"আমি তখন গান্ধীজীর ডানদিকে পাঁচ দশ পা দূরে ছিলাম। আক্রমণকারী গান্ধীজীর সামনে হঠাৎ এসে উপস্থিত হল। কিন্তু সে কোন্ দিক দিয়ে এসেছিল তা আমি ঠিক বলতে পারছিনা। তারপর অমি পিস্তলের গুলির শব্দ শুনলাম। আমি আক্রমণকারীর দিকে লাফ দিলাম, এর মধ্যে আমি তিনবার পিস্তলের গুলির আওয়াজ শুনলাম। আমার হাতে ছিল একটা খুরপি, খুরপিটা ছিল প্রায় সাত আট ইঞ্চি লম্বা। আমি আক্রমণকারীর পিছন দিকে তা দিয়ে দুইবার আঘাত করলাম। আমি আক্রমণকারীকে পিছন দিক দিয়ে ধরলাম। আক্রমণকারীকে দুইজন আরক্ষী ও একজন সৈনিকও ধরেছিল। সেই আরক্ষী অক্রমণকারীর পিস্তল কেড়ে নিয়েছিল!"

দিল্লির আর একজন ব্যবসায়ী শ্রী গুরুচরণ সিং গান্ধীজীর কাছে সবসময় যাতায়াত করতেন। তাঁর কম্বলের ব্যবসা ছিল। তিনি কেন্দ্রীয় উদ্বাস্তু সমিতির সদস্যও ছিলেন। সেইদিন দুপুর তিনটা থেকে তিনি বিড়লা ভবনে ছিলেন। "বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি সময়ে গান্ধীজীকে প্রার্থনার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ইশারা করলাম। আমি প্রার্থনার জন্য বেরুতে গিয়ে দুই একজনের সাথে কথা বলতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেলো। মহাত্মা গান্ধী যখন প্রার্থনা করতে বেরোন তখন কয়েকজন লোক তাঁর আগে আগে ভীড় দূর করার জন্য থাকত আর কয়েকজন থাকত তাঁর পিছনে। সাধারণত আমি থাকি গান্ধীজীর পাশে কিংবা তাঁর আগে। সেইদিন কিন্তু গান্ধীজীর রোজকার সাথীদের মধ্যে কেউই তাঁর আগে আগে ছিল না! নন্দলাল বাঁদিকে আর বৃজকিশন ছিল পিছনে। প্রার্থনাসভার মাঠে প্রচুর লোক অপেক্ষা করছিল। আমি গান্ধীজীর সামনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গান্ধীজীর সামনে কয়েকজন মহিলা থাকায় তা সম্ভব হল না! তখন আমি অন্যদিক দিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করলাম। সেই সময় একটা গুলির আওয়াজ শুনলাম। কিন্তু সেই আওয়াজ কোন দিক থেকে এসেছিল আমি বুঝতে পারি

নি! গান্ধীজীর সামনের দিকে যাওয়ার জন্যই আমি চেষ্টা করছিলাম। গুলির আরও একটা আওয়াজ শুনলাম। তখন যে গুলি ছুঁড়ছিল তাকে আমি আমার সামনেই দেখতে পেলাম! তার হাতে পিস্তল দেখলাম! আমি সেই আক্রমণকারীর হাতে আঘাত করলাম। আঘাত করতে না করতেই তৃতীয় গুলিও ছোঁড়া হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হয় তৃতীয় গুলি ছোঁড়ার পরই আমি তার হাতে আঘাত করেছি। সাথে সাথে অনেকে এসে আক্রমণকারীকে ধরে ফেলল। তখন আমি মহাত্মা গান্ধীর দিকে আমার লক্ষ্য কেন্দ্রিত করলাম।"

শ্রী গুরুচরণ সিং-এর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল ৩০-৮-৪৮ তারিখে।

উপরোক্ত ধরনের বক্তব্য সাক্ষীদের কাছ থেকে এসেছে। তা সম্পূর্ণ দেওয়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না! তাই বিরত থাকলাম!

নাথুরাম আগেই নিশ্চিত করে রেখেছিল, ত্রিশ জানুয়ারীর ঘটনা সম্বন্ধে যে সাক্ষী দাঁড় করানো হবে তাদের কোনরকম জেরা করা হবে না। "ত্রিশ জানুয়ারীর ঘটনার জন্য আমিই দায়ী অতএব সাক্ষীদের বক্তব্য যে মিথ্যা তা প্রমান করে আমার কি লাভ?" নাথুরামের এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকায় ওই সাক্ষীদের বক্তব্য যে নিজেদের মিথ্যা কৃতিত্ব জাহির করার জন্য অতিরঞ্জিত বা অসত্য তা যাচাই করে প্রমান করা সম্ভব হয় নি। তাদের বক্তব্য বা সাক্ষ্য যথারীতি সেইরকমই রয়ে গেল।

আসলে কি ঘটেছিল তা জানবার জন্য আমরা, যারা সে ঘটনা দেখিনি তাদের মধ্যে কৌতুহল ছিল। যে যে বিষয়ে সন্দেহ হয় সে বিষয়ে আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি "ধোঁয়া দেখলাম" এই বক্তব্য সম্বন্ধে নাথুরামকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল 'আমার ধারণায় ধোঁয়া বেরোয় নি, সামান্য গন্ধ শুধু বেরিয়েছিল!'

"তাহলে অস্ত্র বিশেষজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করলে হয়; তার সাক্ষ্য এখনও হয় নি!" (ডক্টর ডি. এন. গোয়েল, সাইন্টিফিক ল্যাবরেটারীর ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁর সাক্ষ্য ২-৮-৪৮ তারিখে নেওয়া হয়েছে গ্রন্থ ১ পৃষ্ঠা ১১৮) নাথুরাম জবাব দিল "ধর অস্ত্র বিশেষজ্ঞ মতপ্রকাশ করলেন যে ধোঁয়া বের হওয়া সম্ভব নয় তাহলে সাক্ষী অমরনাথ না দেখেও মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে, বড়জোর এইটুকুই প্রমান হবে। কিন্তু হত্যার দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার আমার যখন ইচ্ছাই নেই তখন জেরা করার ঝামেলায় প্রয়োজন কি? অভিযোগকারীদের যদি ইচ্ছা হয় তবে তারা নিজেরাই দেখুক যে তাদের তরফের সাক্ষীরা অন্ততঃপক্ষে যুক্তিসঙ্গত বলছে কি না?"

দিল্লির আরাভিং বুগ্নালয়ের প্রধান কর্নেল বি. এল. তনেজা, তাঁর সাক্ষ্যতে গান্ধীজীর শরীরে পাঁচটা আঘাতের কথা বলেছেন। পিস্তলের গুলিতেই মৃত্যু হয়েছে বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেছেন।

তাঁর বক্তব্যের প্রতিলিপি অভিযুক্ত পক্ষকে আগেই দেওয়া হয়েছিল, তাই আইনবিদ্‌দের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হত। শব ব্যবচ্ছেদ (Post mortom) করে পরীক্ষা করা হয়নি আবার কয়েকজন বিশেষজ্ঞদের বর্ণনা অনুযায়ী পিস্তলের গুলিতে যে ধরণের আঘাত হয় তার সাথে শ্রী তনেজা বর্ণিত্র আঘাতের বিবরণ মিলছে না!

গান্ধীজীর মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে শ্রী তনেজার মত যেন গ্রাহ্য করা না হয়। মৃত্যু গুলিতেই হয়েছে, এ যেন ধরা না হয়। আর যদি গুলিতেই হয়েছে বলে ধরা হয়, তাহলেও নাথুরামের কাছে যে পিস্তল পাওয়া গেছে সেই পিস্তলের গুলিতে হয়েছে তা যেন মানা না হয়। আর সেই পিস্তলেও যদি হয়ে থাকে তবে নাথুরাম সেই পিস্তল ধরেইনি বা ব্যবহার করেনি, এ যেন গৃহিত হয়। কারণ সাক্ষীদের বক্তব্য অনুযায়ী তার হাতের অস্ত্র দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিল! এই ধরণের যুক্তিজাল বিস্তার করার জন্য আইনবিদ্‌গণ তৈরী হচ্ছিলেন।

"কিন্তু আমার পিস্তলের গুলিতেই গান্ধীজীর মৃত্যু হয়েছে"—একথা ন্যায়ালয়ে বলা হবে তা নাথুরাম আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাই শ্রী তনেজা সাক্ষ্য দেওয়ার পর নাথুরাম তার আইনবিদ্‌কে কোন প্রশ্ন করতে দেয়নি। ১২-৭-৪৮ এ শ্রী তনেজার সাক্ষ্যর সাথে ন্যায়াধীশ লিখে রাখলেন "জেরা করা হয়নি" (Cross Examination nil গ্রন্থ-১, পৃষ্ঠা ৫৫) তাই আজ মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে নাথুরামের স্বীকারোক্তিকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করার মতো (Collaboration) কিছু থাকলে তা হল শ্রী তনেজার অনুমোদন!

গান্ধী হত্যার ঠিক পরবর্তী সময়ে নাথুরামের মাথায় দুই তিনটা আঘাত করা হয়েছিল, তা থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছিল। রঘুনাথ মালী তার সাক্ষ্যতে বলেছে নাথুরামকে সে খুরপি দিয়ে আঘাত করেছিল, নাথুরাম আমাদের বলল "মালী সম্পূর্ণ মিথ্যা বলেছে কারো হাতের লাঠির দুই তিনটা আঘাত আমার মাথায় করা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই যখন ডাক্তার আমাকে পরীক্ষা করেছিল তখন রক্ত জমে গিয়েছিল। আমাকে করা আঘাতের বিবরণ ডাক্তার লিখে রেখেছেন, আঘাতের ধরণ "স্পষ্টতঃ সামান্য" (All apparently simple), মাধ্যম—"শক্ত এবং ভোঁতা (Blunt), হাতিয়ার"। (সম্পূর্ণ প্রতিবৃত্ত গ্রন্থ-৪, পৃষ্ঠা ১৮৭, নম্বর পি. ২৪৯) "খুব তৎপরতার সাথে আমি নাথুরামকে ধরেছি" একথা প্রায় সব সাক্ষী বলেছে, সে বিষয়ে নাথুরাম আমাদের বলেছে "আমার হাতে ছিল অস্ত্র, আমি গুলি করেছিলাম, আরও গুলি যে করবো না এরকম ভরসা কেউ করতে পারছিল না। সশস্ত্র আরক্ষীদের মধ্যে কেউ যদি তখন আমায় গুলি করতো তাহলে তা নিঃসন্দহে সমর্থনীয় হত!"

"কিন্তু আসলে হল কি,—হঠাৎ গুলির শব্দ হওয়াতে সবাই ভীত ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়ল, যারা একদম কাছে ছিল তারা আমার হাতে অস্ত্র দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে বোধ হয় এই কথাই ভাবছিল যে আমাকেও গুলি করবে না তো! তাই সবাই তৎক্ষনাৎ অন্তত পাঁচ সাত পা পিছিয়ে গেল। গান্ধীজীর চলার জন্য ভীড় ফাঁকা করে একটু রাস্তা করা হয়েছিল। আমি সেই খালি রাস্তার উপর দাঁড়িয়েছিলাম। সেই খালি রাস্তা আরও খালি হয়ে গেল। চার পা দুরত্বের মধ্যেই গান্ধীজী পড়েছিল। আমার হাত ছিল উপরের দিকে, তাই দেখে হয়তো লোক আর পিছনে সরে যায়নি!"

"গুলি মেরেই আমি পিস্তল শুদ্ধ হাত উপরের দিকে তুলে ধরেছিলাম, 'পুলিশ পুলিশ' বলে নিজেই চিৎকার করলাম। আধ মিনিট হয়ে গেলো তবু কেউই কাছে আসছে

না! প্রতিক্ষণ আমার মানসিক উত্তেজনা বাড়তে লাগলো! আমি অত্যন্ত অস্থির হচ্ছিলাম। আমার মনে হয় আমি উত্তেজিত হচ্ছিলাম।"

আমি মাঝখানে থামিয়ে নাথুরামকে প্রশ্ন করলাম, "তোমার মানসিক উত্তেজনার আর অস্থির হওয়ার কারণ কি? তখন পর্যন্ত কেউ তোমাকে মারবার জন্য হাত উঠায়নি।"

"আমার তখনকার মানসিক অবস্থা কি রকম ছিল তা আমি আজ, এইসময়ে বুঝতে পারছি। কেউ আমাকে মারছে বা মারতে এলে কিভাবে প্রতিকার করব এই চিন্তা তখন আমার মনেও স্থান পায়নি। গান্ধীহত্যার জন্য যে কোন পরিণামের মোকাবিলা করতে আমি তৈরী ছিলাম। কিন্তু আমি চাইছিলাম না যে আমার বিরুদ্ধে তিনরকম অভিযোগ হোক, প্রথমতঃ আমি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি এ অভিযোগ আমি চাইছিলাম না তাই আধ মিনিট পর আমি আবার 'পুলিশ পুলিশ' বলে চীৎকার করলাম। সামনে উর্দি পরিহিত আরক্ষীও আমি দেখছিলাম। তারা আমাকে ধরতে সাহস করছিল না! দ্বিতীয়তঃ পিস্তল ফেলে দিলে, 'প্রমান লুপ্ত বা গোপন করার চেষ্টা করছি' এই অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে আমি চাইছিলাম না! আমি আমার অস্ত্রসহিত আত্মসমর্পণ করতে চাইছিলাম; কিন্তু তা তাদের কি করে বোঝাব তা আমি ঠিক করতে পারছিলাম না!"

"আর তৃতীয় অভিযোগ, যা তুমি চাইছিলে না?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"যেই অভিযোগের ভয়ে বিশ জানুয়ারীর দিনটি কার্যকারী করা গেলো না, সেই অভিযোগ"

"মানে?"

"আমি চাইছিলাম কোন অবস্থাতেও যেন আর কারও আঘাত না লাগে, তাই আমি পিস্তলসমেত হাত উপরের দিকে তুলে আরক্ষীর অপেক্ষায় রইলাম। যদি ভুল করেও আমি হাত নিচু করে পিস্তল নাড়াচাড়া করতাম তা হলে আমাদের উপর পিস্তল তুলেছিল বলে কয়েকজন সাক্ষীও হাজির করা হতো। এই অভিযোগ আমি চাইছিলাম না!"

"তাহলে তোমাকে ধরল কি করে?"

"আমি চারদিকে তাকালাম। বোধহয় অমরনাথের সাথে অথবা যে সৈনিক বলে পরিচয় দিচ্ছে তার সাথে আমার চোখাচোখি হল। ইশারায় আমি তাকে কাছে ডাকলাম। আমার দৃষ্টিকে হয়তো সে বিশ্বাস করল। কাছে এল। আমার হাতের পাঞ্জা উপরে ছিল, উপরের দিকেই ধরে রাখলো এবং বুঝল যে আমি আরও গুলি চালাতে ইচ্ছুক নয়। আমার উত্তেজনা তৎক্ষনাৎ কমে এলো। আমি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম। সাথে সাথে আরও একজন এল সে আমার অস্ত্র ধরল। আমি অস্ত্র তার হাতে ছেড়ে দিলাম!"

"আর তারপর অন্যরা আমার কাছে এলো, তারা আমাকে ঘিরে ফেলল। কেউ হাত দিয়ে মারতে লাগলো। আরক্ষীটা ছিল এমন নির্বুদ্ধি যে, সে কৌতুহলবশে পিস্তল একহাত থেকে অন্যহাতে নাড়াচাড়া করছিল। একজন, পিস্তলটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আমার সামনে ধরে বলল 'আমি তোকে এই পিস্তল দিয়েই হত্যা করব' আমি

শান্তভাবে ঐ গোলমালের মধ্যেও সে শুনতে পারবে এমনভাবে বললাম, অবশ্যই কর। কিন্তু পিস্তল কিভাবে ব্যবহার করে তা তুমি জান বলে মনে হয় না। সেফটি-ক্যাচ খোলা রয়েছে এবং গুলি ভরা আছে! অসাবধানে তোমার হাতে হয়তো অন্য কেউ মারা পড়বে! তারপর আমি নিকটবর্তী আরক্ষী অধিকারীকে বললাম, আগে পিস্তল তোমার কাছে নাও, সেফটি-ক্যাচ খোলা রয়েছে, বন্ধ কর! নয়তো ও আমার বদলে অন্য কারোর প্রাণ নেবে! সেই অধিকারী পিস্তল নিয়ে নিল। সেফটি-ক্যাচ বন্ধ করে পকেটে রাখলো এই গণ্ডগোল পাঁচ মিনিট ধরে চলছিল এর মধ্যে আরও কয়েকজন আরক্ষী আমাকে ঘিরে ফেলেছিল। অধিকারীদের নির্দেশ অনুযায়ী তারা আমাকে ঐ ভিড়ের ভেতর থেকে সরিয়ে তাঁবুর দিকে নিয়ে চলল। ঐ সময় আমাকে কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করায় রক্ত পড়ছিল।"

"প্রত্যক্ষ ঘটনা সম্বন্ধে তুমি এখনও কিছু বললে না!" আমি মনে করিয়ে দিলাম।

"সন্ধ্যা পাঁচটার মিনিট দশেক আগে, আমি বিড়লা ভবনের দরজার সামনে পৌঁছুলাম। প্রার্থনার জন্য যারা আসছিল দরজার প্রহরীরা তাদের নিরীক্ষণ করছিল এটাই ছিল আমার সবচেয়ে বড় ভয়। তাই চারপাঁচ জনের দলের সাথে মিশে তাদেরই দলের একজন হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ভিতর প্রায় ফাঁকা ছিল! এদিক ওদিক যে সব প্রহরীরা ঘোরাঘুরি করছিল তারা সব যেন আমার দিকেই দেখছে বলে মনে হতে লাগল। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অপেক্ষাকৃত বেশি ভীড়ের মধ্যে মিশে গেলাম!"

"পাঁচটা বেজে মিনিট দশেক পার হয়ে গেলো। দেখতে পেলাম গান্ধীজী ও তাঁর সহকারীরা ঘর ছেড়ে প্রার্থনা স্থলের দিকে আসছেন। প্রার্থনাস্থলের মাঠের সিঁড়ির কাছাকাছি ভীড়ের মধ্যে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম।"

"গান্ধীজী সিঁড়ি দিয়ে ময়দানে পাঁচ, ছয় পা এগিয়ে এসেছিলেন। তিনি দুইজন মহিলার কাঁধের উপর ভর দিয়ে আসছিলেন!"

"পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি পিস্তলের সেফটি-ক্যাচ খুলে ফেললাম। যদিও গান্ধীজীর কাছাকাছি অনেক লোক ছিল তবুও আমি যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম তা আমি পেতে চলেছি।"

"আমার আর তিন সেকেণ্ড সময়ের প্রয়োজন; দুই পা এগিয়ে গান্ধীজীর সামনে যাওয়া, অস্ত্র বের করা আর গান্ধীজী সারা জীবন ধরে যে দেশসেবা করেছেন তার জন্য তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো!"

"ঐ দুইজন মহিলার মধ্যে একজন গান্ধীজীর খুবই কাছে ছিল। ওর যেন আঘাত না লাগে সেই উপায় চিন্তা করে আমি এগিয়ে এলাম। গান্ধীজীকে, অস্ত্রসমেত হাত তুলে নমস্কার করার সাথে সাথে মৌখিক সম্বোধনে 'নমস্তে'ও বললাম। আরও একপা এগিয়ে এসে ঐ মহিলাকে বাঁ হাতে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলাম!"

"পরক্ষণেই হল সেই অশান্ত বিস্ফোরণ। পলকের মধ্যে গান্ধীজীর কৃশ শরীর "আঃ" ঐইরকম অতিশয় অস্পষ্ট শব্দ করে অচেতন হয়ে ধরাশায়ী হল"

"গান্ধীজীর অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, অশেষ্য আত্মা অন্তরীক্ষে বিলীন হচ্ছিল। আর আমি জীবন্ত সমাধিতে প্রবেশ করছিলাম!"

"মনুষ্যজাতিকে উন্নত করার অতি
সরলীকৃত ও কৌশলহীন
তত্ত্বজ্ঞান,
ভুল জায়গায় ব্যবহার করলে—
দেশের মাটি
রক্তে রাঙ্গা হয়।"

'বিভাজনের আঘাত'

ন্যায়াধীশ কপুরের নেতৃত্বে 'গান্ধী হত্যা' এ বিষয়ে কিছুদিন আগে এক তদন্ত সমিতি বসেছিল, হত্যা এড়ানো সম্ভব ছিল কিনা কিংবা শাসকীয় কর্মচারীদের উদাসীনতা দায়ী ছিল কিনা,—এইসব ন্যায়াধীশের দেখার বিষয় ছিল, এর জন্য তখনকার দিল্লির পরিস্থিতি কেমন ছিল—তা জানা যেমন বিশেষ প্রয়োজন ছিল এবং তার সাথে সাথে গান্ধীজীর বিষয়ে জনগণের মত কেমন ছিল তা জানবারও প্রয়োজন ছিল। ন্যায়াধীশ কপুর তাঁর প্রতিবৃত্তে এ বিষয়ে কিছু পুস্তকের উদ্ধৃতি এবং কিছু সাক্ষীর সাক্ষ্যের আধারে তা উপস্থিত করেছেন। [কপূর আয়োগ (কমিশন) প্রতিবৃত্ত ১ম ভাগ ১৩৩ পৃষ্ঠা]

ন্যায়াধীশ জি. ডি. খোসলার লেখা "The Stern Reckoning" বইতে হিন্দুস্থানের প্রাক্ বিভাজন ঘটনা এবং বিভাজনের ভয়ানক পরিণাম বিষয়ে যা লেখা আছে, বিচারপতি কপুর তার আধারও তাঁর প্রতিবৃত্তে গ্রাহ্য ধরেছেন।

"মানুষের স্থানান্তরণ এবং প্রতিস্থানান্তরণ (অদলবদল) নিজের নিজের ইচ্ছায় যদি হয়, তবেই সম্ভব" একথা জিন্না ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর DON পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। আসলে জিন্না লোকের মন বুঝতে চাইছিলেন। দেশের যে ভাগ পাকিস্তানে যাচ্ছিল সেখানকার হিন্দুদের এতে মত ছিল না! কিন্তু মুসলিম লীগের এ ব্যাপারে ভীষণ তাড়া ছিল। কারণ তাতে যারা পাকিস্তান নির্মানের বিরোধী ছিল তারা জব্দ হত। পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বাংলার হিন্দুরা, নিজের নিজের ঘরবাড়ী, ভূমি ব্যবসা যা তারা কয়েক পুরুষ কষ্ট করে তৈরী করেছে তা ছেড়ে জিন্নার খামখেয়ালীর কাছে মাথা নত করে অন্য কোথাও নির্বাসিত হবার জন্য তৈরী ছিল না। অন্যদিকে উত্তরপ্রদেশ, বোম্বে, মাদ্রাজ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ—এসব জায়গার মুসলমানেরা নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়ে, কোন অন্য প্রদেশে গিয়ে থাকা মেনে নিতে পারছিল না। কাজেই এই অসুবিধা দূর করার জন্য মুসলিম লীগকে অন্য উপায় খুঁজতেই হ'ল। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১)

কলিকাতার নরসংহারের মহান প্রয়োগ সফল হোল না! কিন্তু ঐ প্রয়োগ নোয়াখালি এবং ত্রিপুরায় সফল হল, সেখানকার হিন্দুদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা, তাদের সম্পত্তি লুটপাট, মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং অনেক হিন্দুদের বলপ্রয়োগে ধর্মান্তর করা তাদের পক্ষে সম্ভব হল! মানুষের স্থানান্তর এবং প্রতিস্থানান্তরের জন্য এই উপায়টাকেই মুসলিম লীগ বেশী উপযোগী বলে মনে করল। তার প্রতিক্রিয়া বিহারে হল! সেখানকার মুসলমানদের সিন্ধে যেতে হল! ১৯৪৬ খৃঃ ২৬শে নভেম্বর জিন্না DON পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে আরও একবার স্থানান্তরণ-প্রতিস্থানান্তরনের প্রশ্ন উপস্থিত

করলেন। দেশের সমস্ত জায়গায় হিন্দুরা এর প্রতিবাদ করল। কিন্তু মুসলিম লীগ সমর্থন জানালো! শুধু তাই নয়, পাঞ্জাবের মুসলিম নেতা 'মম্‌দোত' এর নবাব, স্থানান্তরণ-প্রতিস্থানান্তরণ, কাজে রূপান্তরীত করার ভয়ও দেখাতে লাগলো। (অনুচ্ছেদ ১২এ/২)

Sir Evan Jokins তখন পাঞ্জাবের রাজ্যপাল ছিলেন। তিনি বললেন, 'মম্‌দোত' এর নবাবের এই হুমকি মানেই হিন্দুদের পাঞ্জাব থেকে ছলেবলে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করা! কিন্তু মুসলিম লীগের নেতারা তার প্রতিবাদ করল এবং পাঞ্জাবের সংখ্যাগুরুর দয়ার উপর নির্ভর করে সংখ্যালঘুদের থাকা যে কিরকম ভীতিজনক তা জানাল। (অনুচ্ছেদ ১২এ/৩)

'স্যার ফিরোজ খাঁ নুন', 'চেঙ্গিস খান' এবং 'হলাকু খান' যে ভাবে অত্যাচার করেছিল তার পুনরাবৃত্তি হবে বলে হুমকি দিতে লাগলেন। ১৯৪৭ এর জানুয়ারীতে মুসলমানেরা এমন হিংস্র আন্দোলন আরম্ভ করল ;—যার ফলে পাঞ্জাবের সংযুক্ত মন্ত্রিমণ্ডলের পতন হল! (অনুচ্ছেদ ১২এ/৪)

* পাঞ্জাবের হিন্দু নেতারা বিশেষ করে মাষ্টার তারা সিং কড়া ভাষায় এই অত্যাচারের বিরোধ করেছেন বলে তার উপর দোষ চাপানো হল। কিন্তু এর কোন প্রমান ছিল না! মুসলমানদের ছলের অভাব ছিল না (এবং কখনও থাকে না)। নৃশংসভাবে সংহার হল হিন্দুরা–অসহায় হিন্দু রমনীরা নারকীয় ধর্ষণের বলি হলেন—যা কুখ্যাত হয়ে আছে ইতিহাসে "রাওলপিণ্ডির বলাৎকার" নামে! এই অত্যাচারের হাত থেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেক হিন্দুরা, ইচ্ছার বিরুদ্ধে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হল! হিন্দু এবং শিখ মহিলারা নিজেদের লজ্জা বাঁচাবার জন্য "জহর ব্রত" (দলবদ্ধভাবে আত্মহনন) করল! কারণ লজ্জা বাঁচাবার, তাদের কাছে আর কোন বিকল্প ছিল না! (অনুচ্ছেদ ১২এ/৫)

পশ্চিম পাঞ্জাবে মুসলমানদের চাপে স্থানান্তরণ-প্রতিস্থানান্তরণ চলতে লাগলো। হিন্দুদের ওপর ক্রুর, ভয়ানক, অমানুষিক অত্যাচার হোক—এই ছিল তাদের ইচ্ছা ও কাম্য। ভীত সন্ত্রস্ত উদ্বাস্তুদের গাড়ীতে গাড়ীতে আগমন শুরু হল! তার বর্ণনা হৃদয়-বিদারক। গাড়ীর ভিতরে শ্বাস নেবার মতো জায়গা নেই, তবুও মানুষ বাস্তুহারা হয়ে, পুরো সংসার সমেত, প্রাণ হাতে নিয়ে নিজেদের জন্মভূমি ছেড়ে চলে এসেছে এমন কি গাড়ীর ছাদে চড়েও। (অনুচ্ছেদ ১২এ/৯)

যে কোন স্টেশনে, বিনা কারণে ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকবে, জলের নল ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, খাবার পাওয়া যাবে না, ক্ষুধা তৃষ্ণায়, কোলের ছোট ছোট বাচ্ছাদের মৃত্যু তো রোজকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মা-বাবা নিজেদের কোলের বাচ্ছাকে জলের বদলে স্ব-মূত্র পান করিয়েছে—এরকম ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু তা তাদের শরীরে জমা হবেই বা কোথা থেকে? উদ্বাস্তুদের গাড়ীর উপর আক্রমণ হতে লাগলো। যে কোন গাড়ী রাস্তায় দাঁড় করানো হত, ছোট ছোট মেয়েদের বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যাওয়া হত। যুবতী মেয়েদের ধর্ষণ করা হত—না হয় বলপ্রয়োগ করে নিয়ে যাওয়া হত! আর

অবশিষ্টদের হত্যা করা হত। এর মধ্য থেকে যদি কেউ বাঁচলো, তবে "আমার প্রাণটা বাঁচলো"—এই তার সমাধান। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১০)

উদ্বাস্তুদের দল একের পর এক কাতারে কাতারে এগিয়ে চলছিল। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পথক্লান্ত হয়ে চলবার শক্তি হারিয়ে ফেললে, তাদের ঐ অবস্থাতেই রাস্তার পাশে, মরবার জন্য ফেলে রেখে দল এগিয়ে চলেছে। রাস্তায় পচা মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। তার দুর্গন্ধ চারদিকে ছড়াচ্ছে। শকুন ও হিংস্র জানোয়ার মনের আনন্দে ভক্ষণ করছে। এইরকম এক একটা দলের অর্থাৎ পরাভূত, মানসিক ও শারীরিক আঘাতগ্রস্ত, শোক বিহ্বল ও অসহায় মানুষের অবিরাম পথ চলা অব্যাহত থেকেছে! (অনুচ্ছেদ ১২এ/১১)

মুসলিম লীগ এবং পাকিস্তান নির্মাণের পক্ষে যারা উত্তেজনা ছড়াচ্ছিলো তাদের অহেতুক উদ্দেশ্যই ছিল যেখানে সংখ্যালঘুদের তাড়ানো, তাদের কাছ থেকে কোনরকম সহানুভূতির আশা করা ছিল অর্থহীন। রক্ষক, (Escort) হিসাবে, রক্ষী (Police) যারা থাকতো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা মুসলমান, তাদের কাছ থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের সংরক্ষণ পাওয়া সম্ভব ছিল না।উদ্বাস্তুদের পক্ষেও তাদের বিশ্বাস করা অসম্ভব ছিল। কারণ উদ্বাস্তুদের রক্ষা করার চেয়ে যে সব মুসলমানরা এই অসহায় লোকদের লুটপাট করত সেই স্ব-জাতীয়দের সাথে সহভাগী হওয়াতেই এদের উৎসাহ থাকতো বেশী। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১২)

পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা উদ্বাস্তুদের গাড়ীর ওপর অনেক আক্রমণ হতে লাগলো, কিন্তু ১৫ আগষ্ট ১৯৪৭ এর পরে যে সব আক্রমণ ও অত্যাচার হয়েছে, তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর। 'ঝিলম' জেলার 'পিণ্ড দাদ্‌খান' গ্রাম থেকে যে উদ্বাস্তুদের গাড়ীগুলি বেরিয়েছিলো, তাদের ওপর তিন জায়গায় আক্রমণ করে ২০০ জন মহিলাকে হত্যা অথবা বলপ্রয়োগ করে নিয়ে গেল। 'বাহ' থেকে বেরনো উদ্বাস্তুদের গাড়ী আক্রান্ত হল বাজিরাবাদের কাছে। সেই গাড়ী সোজা লাহোর আসতে না দিয়ে শিয়ালকোটের দিকে ঘুরে যেতে বাধ্য করা হল। এইসব ঘটনা সেপ্টেম্বর মাসের। আবার অক্টোবর মাসে শিয়ালকোট থেকে আসা একটা গাড়ীর ওপর তারই পুনরাবৃত্তি ঘটল। কিন্তু বেশী অত্যাচারের ঘটনা ঘটল ১৯৪৮ এর জানুয়ারী মাসে। বন্নু থেকে লাহোরের পথে বেরনো গাড়ীর উপর 'গুজরাট' (পাঞ্জাবের একটা জেলার নাম) ও 'খুশবু'তে আক্রমণ করে অনেক হিন্দুদের হত্যা করা হল। 'খড়গোদা' ও 'লারকপুর' হয়ে সোজা রাস্তায় না এনে, ঐ গাড়ী খুশবু, মালকবাল, লালমোসা, গুজরাট, বাজিরাবাদ এই ঘুরপথে লাহোরে আনা হল। বিহার রেজিমেন্ট রাস্তায় প্রহরী হিসাবে সাথে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের ওপর সশস্ত্র পাঠানরা আক্রমণ করল, বন্দুক চালালো। প্রহরীরাও গুলিতেই প্রত্যুত্তর দিতে লাগলো! প্রহরীদের গুলি যখন শেষ হয়ে গেল, তিন হাজার সশস্ত্র পাঠান গাড়ীর উপর আক্রমণ করল। পাঁচশ লোককে হত্যা করল। সমস্ত জিনিষপত্রও লুটপাট করল। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১৩)

'পারচিনার'-এর হিন্দুদের ওপর সেখানকার মুসলমানেরা আক্রমণ করলো। তাদের কোহাটে সরিয়ে নিয়ে, বিশেষ সুরক্ষায় শিবিরে রেখে পরে ট্রেনে করে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা নেওয়া হলো। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১৪)

(পারচিনার হত্যাকাণ্ড পাকিস্তানের উপেক্ষার পরিণাম বলে "হিন্দুস্থান টাইমস্" ১৮/১/৪৮-এর সংখ্যায় লিখেছে)

এইভাবে হিন্দুদের ছাউনিতে রাখা অবশ্য হ'ল কিন্তু তাদের খাদ্য দ্রব্যের সুষ্ঠু যোগান তো দূরের কথা, কম অথবা ন্যায্য দামেও তা বিতরণের ব্যবস্থা করা হলো না। যখন বরফ পড়তে লাগলো, তখন উত্তর পশ্চিম প্রান্তের রাজ্যপাল ছাউনি ভাঙ্গার আদেশ দিলেন। কিন্তু ছাউনির হিন্দুরা ওই অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও যেতে রাজী হলো না। কারণ নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে তারা ভয় পাচ্ছিল! কিন্তু অদৃষ্ট এখানেও তাদের প্রতিকূল। ২২শে জানুয়ারী গুণ্ডারা হামলা করল। ১৩০ জন হিন্দুকে হত্যা করল। ৫০ জনকে গুরুতরভাবে আহত করল, ৫০ জনকে জোর করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হল! তারপর ১১০০ জন উদ্বাস্তুকে "পারচিনার" থেকে "কোহাট"এ পাঠানো হল। (অনুচ্ছেদ ১২এ/১৫)

যুবতী মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার যথা গনধর্ষণ, এক হাত থেকে অন্য হাতে বিনিময় করে সম্ভোগ এবং পরিশেষে তাদের ক্রয়-বিক্রয় করা মানবিক ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়। কোনক্রমে, কোন মহিলা ছাড়া পাওয়ায়, উপরিলিখিত ওই লোমহর্ষক ঘটনা, তার দ্বারাই বর্ণিত হয়েছে! (অনুচ্ছেদ ১২এ/১৬)

ধর্ষণ, অপহরণ, লুটপাট, জ্বালানো-পোড়ানো এবং নর-সংহার এসবের বৃত্তান্ত যখন পূর্ব পাঞ্জাবে পৌছাল সেখানে তার যা প্রতিক্রিয়া হল, তা খুবই প্রাসঙ্গিক, সাধারণ মানুষের, সীমা-সুরক্ষাদলের ও স্থানীয় অধিকারীদের উপর বিশ্বাস ছিল না! যাদের ওপর অত্যাচার হচ্ছিল তারা তো কারোর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না! কিন্তু নিজেদের রক্ষার জন্য বড় নেতাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করা প্রয়োজন মনে করে জওহরলাল নেহেরু এবং সর্দার প্যাটেলের কাছে ব্যক্তিগত চিঠি পাঠাতে লাগলো "আমার স্ত্রীকে, আমার বাবাকে বা আমার অমুক আত্মীয়কে বাঁচান"—এ ধরণের চিঠি আসতে লাগলো! শুধু তাই নয় প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্থির নীতির অভিযোগ করে "হিন্দুদের ওপর তার কোন সহানুভূতি নেই" এবং "পশ্চিম পাঞ্জাবের হিন্দুদের প্রাণের মূল্যে যে স্বাধীনতা পাওয়া গেল তার ফল তোমরা উপভোগ করছ" ইত্যাদি ধরণের উক্তি করে অভিযোগ পত্র আসতে লাগলো! (অনুচ্ছেদ ১২এ/১৭)

সিন্ধু প্রান্তের সুলতানকোটে মুসলিম লীগের অধিবেশন হল! তাতে যে গান গাওয়া হল, পাকিস্তান নির্মাণের যারা পক্ষে তাদের মনস্কামনা তাতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। গানের ভাবার্থ এইরকম—

* পাকিস্তানে ইসলামের স্বতন্ত্র কেন্দ্র
যেন নির্মাণ হয়
পাকিস্তানে অমুসলমানদের মুখ দেখার দুর্ভাগ্য
যেন আমাদের না হয়
মুসলিম রাষ্ট্রের ঘর সেদিনই
উজ্জ্বল হবে
যেদিন পাকিস্তানে মূর্তিপূজক কন্টকদের অস্থিত্ব
নিঃশেষ হবে
হিন্দুদের অধিকার হল শুধু
গোলাম থাকার
এই সব গোলামদের রাজ্যশাসনে অংশগ্রহণে
কি অধিকার?

(অনুচ্ছেদ১২এ/১৯)

জলন্ধর এবং লুধিয়ানার মাঝে আবার লুধিয়ানা ও রাজপুরার মাঝে গাড়ীর উপর হিন্দুরা আক্রমণ করল। পাতিয়ালার শিখেদের এজন্য দায়ী করা হয়। তখনকার অধিকারীবর্গ এই আক্রমণ থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু তা থামাবার মত মানসিক প্রস্তুতি শিখদের ছিল না। কিন্তু এবিষয়ে একথাও বিবেচনা করতে হবে, যে এর আগে পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের অত্যাচারে বিশেষ করে শিখরাই ছিল মুসলমানদের লক্ষ্য। শিখদের প্রাণ কোথাও সুরক্ষিত ছিল না! তাদের দেখলেই হত্যা করা হত! (অনুচ্ছেদ ১২এ/২০)

সিন্ধ-এও এরকম ঘটনা ঘটছে! ১১ই জানুয়ারী ১৯৪৮ এর একটা ঘটনা প্রমান (Evidence) নং ২৬০ এর সাথে দেওয়া হল,—

* ৮৫০ জন হিন্দু উদ্বাস্তুদের একটা দল ৯ই জানুয়ারী ১৯৪৮-এ ওখা বন্দরে এসে নামলো, কেট্টা (Ketta) মেলে কেট্টা থেকে যারা করাচী গিয়েছিল এরা তাদেরই কয়েকজন। তাদের লুটপাট করা হল—অত্যাচার করা হল! শিখদের সাথে সাথে সিন্ধিদেরও কিভাবে সংহার করা হল—তার বর্ণনাও এই প্রমানপত্রে (Evidence) আছে। তাদের মেয়েদের অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়া হল—এমনকি নাকের নথও বাদ পড়লো না! (অনুচ্ছেদ ১২এ/২১)

১৫ই জানুয়ারী ১৯৪৮ এর একটা চিঠি দলিল (Document) নং ২৬০ এর সঙ্গে যুক্ত করা হল, এই চিঠি (Circular) বোম্বের গুপ্তচর বিভাগের উপ-অধিকারীর (D.I.G.–C.I.D branch) তরফ থেকে বোম্বে জেলার আরক্ষী অধিক্ষক (District Police Superinten dent) সম্পর্কিত পুলিশ উপ-অধিকারীকে (D. I. G. of other range) পাঠানো হয়েছিল। "৬ই জানুয়ারী ১৯৪৮ এ করাচীতে দাঙ্গা (Riot)

হল। মুসলমানরা হিন্দুদের এবং শিখদের উপর দারুণ অত্যাচার করল। তাদের মধ্যে ৮৫০ জন হিন্দুর একটা দল "কাঠেবারের" ওখা বন্দরে এসে পৌঁছেছে, আরও উদ্বাস্তু আসছে। তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, গুজরাটি, মারোয়ারী প্রভৃতি সকল প্রান্তের লোক আছে। এইসব উদ্বাস্তুরা মুসলমানদের রক্ত চায়"। ঐ চিঠিতে (Circular) এই ঘটনার প্রতিবেদন আছে। (অনুচ্ছেদ ১২এ/২২)

ন্যায়াধীশ কপুরের দিল্লির তখনকার পরিস্থিতির বিবরণ এবং তার জন্য প্রদত্ত ঘটনা কিংবা দলিল (**Document**) একতরফা—এই ধরণের অভিযোগ হয়তো কেউ করতে পারেন, সাধারণত অনেকেই বলে থাকেন, মুসলমানরা যেভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছে, হিন্দুরাও তেমনি মুসলমানদের হত্যা করেছে। কাজেই এজন্য দুই সম্প্রদায়ই দায়ী। কিন্তু বিভাজনের পাপকে ঢাকার, এ এক অসত্য প্রয়াস, এইভাবে উভয়পক্ষের নরসংহার করে যদি হিন্দুস্থানের বিভাজন থামানো যেত তবে এই নরসংহারে পরস্পরের শোধবোধ হল, একথা মানা যেতো। কিন্তু বিভাজন করে পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যই মুসলিম লীগ খোলাখুলিভাবে অত্যাচার এবং নরসংহার শুরু করল। হিন্দুদের কাছ থেকে যা কিছু প্রতিরোধ হোলো—তা "বিভাজন হতে দেবো না" এই উদ্দ্যেশে নয়। দেশের অন্যান্য জায়গায় যাতে এধরণের অত্যাচার করার সাহস না হয় তার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ—বিভাজনের প্রক্রিয়ায়, লোকসংখ্যার স্থানান্তর-প্রতিস্থানান্তরণ যদি সমান সমান হত, তা হলে রক্তপাতের দোষ একপক্ষের উপর চাপান যেতো না! কিন্তু তা হল না! হিন্দুর সংখ্যা এবং জোর বেশি থাকা সত্ত্বেও হিন্দু নেতারা বিশেষ মতাদর্শের মোহজালে নিজেদের আবদ্ধ রাখলো এবং মুসলমানদের আক্রমণাত্মক ভূমিকার কাছে মাথা নত করল। আমাদের নেতাদের এই ব্যবহারে 'মুসলিম সম্প্রসারণবাদ, দিল্লীতে বিস্তারলাভ করতে লাগলো' এটাই গান্ধী হত্যার পটভূমি। এই মনে করেই, ন্যায়াধীশ কপুর, গান্ধী হত্যার তদন্তের জন্য, এই বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন বলে আমার মনে হয়।

প্রত্যেক সপ্তাহের, প্রত্যেক দিনই পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুরা কাতারে কাতারে আসতে লাগলো। এরা কেউ গরুর গাড়ীতে, কেউ লরীতে, কেউ ট্রেনে, কেউ বিমানে, আবার কেউ কেউ পায়ে হেঁটেও আসতে লাগলো। এইভাবে ১৯৪৭ এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০ লাখ লোক হিন্দুস্থানে এলো। এদের মধ্যে প্রায় সবাই শোকগ্রস্থ ছিল! তারা পরিশ্রান্ত শরীর এবং এই ভীষণ ঘটনার ধাক্কায় ক্লান্ত মন নিয়ে, এই নতুন ঘরে (?) এসে উঠলো! উদ্বাস্তু শিবিরে সুখ সুবিধা ছিল না! তাদের ভবিষ্যৎও ছিল অনিশ্চিত, তবুতো প্রাণ এবং মেয়েদের আব্রু এখানে সুরক্ষিত—এই ভেবেই সীমা পার করার সাথে সাথে শ্রান্ত শরীরে, ক্লান্ত এবং প্রায় নিরব মুখ থেকে যেন বিজয়ের আনন্দ প্রকাশ পেতো। 'আমরা আশ্রয় পেলাম। আমাদের সংকট দূর হল"—এই ভেবেই তাদের শুকনো ঠোঁটে, মুক্ত কণ্ঠে, হিন্দুস্থানকে মান বন্দনা দিত

—"জয় হিন্দ"

(অনুচ্ছেদ ১২এ/১৮, —কপুরের রিপোর্ট)

“ভাবিকালের মানুষ
ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো খুলে দেখবে,
এই বৈভবশালী দেশ,
কি করে—কাদের দ্বারা, কখন, কেন
টুকরো হোল?
সেই রাজনৈতিক নৃত্যনাট্যের
প্রযোজক কে বা কারা?”

"উদ্বাস্তু আর গান্ধীজী"

ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তের প্রথমভাগে ২২৬ পৃষ্ঠায় গান্ধী হত্যার কারণ শীর্ষকে গান্ধী হত্যার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখছেন—

অনেক সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে বোঝা যায় যে ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে না দেবার যে সিদ্ধান্ত শাসন (Government) পরিবর্তন করল—এটাই গান্ধী হত্যার মূল কারণ। ৯-১-১৯৪৮ তারিখে মন্ত্রী মণ্ডলের বৈঠকে —"৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না"—এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ১৩ই জানুয়ারী থেকে গান্ধীজী এর বিরুদ্ধে অনশন আরম্ভ করলেন। সাথে সাথে ১৪ই জানুয়ারী আবার মন্ত্রী মণ্ডলের বৈঠক বসল। তাতে আগের সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করা হল। এই পরিবর্তনকে 'অপূর্ব্ব' (Unique) বলে গান্ধীজী প্রশংসা করলেন। গান্ধীজীর সচিব প্যারেলাল তাঁর লেখা "Mahatma Gandhi—The Last Face" বই এর ২য় খণ্ডের, ৭১৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন—"মহাত্মা গান্ধী জিজ্ঞেস করলেন, "মন্ত্রীমণ্ডল নিজেদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করল কেন? আবার নিজেই উত্তর দিলেন 'নিশ্চয়ই আমার অনশনের জন্য" অনশনের জন্যই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন হল। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১)

প্যারেলাল তার পরের পৃষ্ঠায় লিখেছেন গান্ধীজীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল— এই অনশন পাঞ্জাবে উদ্বাস্তুদের গাড়ীতে হওয়া নরসংহারের ওপর বা করাচী হত্যকাণ্ডের ওপর কোন বিপরীত পরিণাম হবে বলে আপনার মনে হয় না? তখন গান্ধীজী জবাব দিলেন—"তেমন কিছু হতে পারে বলে আমারও মনে হয়েছে, কিন্তু এসব বিচার করে আমি নিজেকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হতে দিতে পারি না!" (অনুচ্ছেদ ১২ আই/২)

পাকিস্তানকে এই টাকা দিয়ে দেবার কিছুদিন পর, শ্রী এন. ভি. গাড়্‌গিল মহারাষ্ট্র সফরে গেলেন। "গান্ধীজীর এই ব্যবহার এখানকার অনেকের পছন্দ নয়" বলে তিনি জানালেন এবং ফিরে এসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে বললেন—সামান্য ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে গান্ধীজীর প্রাণ আমরা কিনে নিয়েছি—এ কথাই আমি লোকেদের বুঝিয়েছি। শ্রী গাড়্‌গিল এখন দুঃখপ্রকাশ করছেন যে, এই অমূল্য প্রাণ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের থেকে বিদায় হবে, একথা তখন কল্পনাও করতে পারিনি। প্রার্থনা স্থলে রিভালবারের গুলির যে বিস্ফোরণ, তা, ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেবারই ফল—এই ছিল শ্রী গাড়্‌গীলের মত! (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৩)

শ্রী রাজাগোপাল আচারী, যিনি মাউন্টব্যাটেনের পর রাজ প্রতিনিধি অর্থাৎ "ভাইসরয়" ছিলেন, তিনি "Gandhi's Teachings and Philosophy" নামে একটা বই লিখেছেন। তাতে তিনি লিখেছেন, সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তাঁকে বলেছেন—

৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেবার যে একগুঁয়েমি গান্ধীজী ধরেছিলেন, তার ফল তিনি পেলেন প্রাণের বিনিময়ে। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৪)

রাজাজী এরপর লিখছেন, গান্ধীজীর মত এই ছিল যে হিন্দুস্থানকে নিজেদের চুক্তি মেনে চলা উচিৎ। স্বাধীনতা পর্বের শুরুতেই যেন বচনভঙ্গ না হয়, তাঁর মতে, হিন্দুস্থান ৫৫ কোটি টাকা না দেওয়া মানেই হিন্দুস্থানের নৈতিক বল নষ্ট হওয়া। হিন্দুর গুলিতে না মরলেও গান্ধীজী হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে মারা যেতেন। কিন্তু ৫৫ কোটি টাকা দেওয়াতে হিন্দুস্থানের নৈতিক বল অনেক বাড়লো! (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৫)

পুরুষোত্তমদাস ত্রিকম্‌দাস (একজন সাক্ষী) তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন, গান্ধী হত্যার কারণ ঃ—(১) তার মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতি, (২) কলিকাতা ও নোয়াখালিতে তাঁর শান্তিস্থাপনার (অশুভ) প্রয়াস (৩) ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার একগুঁয়েমি। (যা তিনি অনশন করে আদায় করলেন)। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৭)

পাঞ্জাবে কিংবা উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে যে সব হিন্দু, শিখ পূর্ব-পাঞ্জাবে কিংবা পশ্চিম-উত্তর প্রদেশে এলো, তারা আশা করে এসেছিল যে তারা নিজেদের রাষ্ট্রভূমি কিংবা মাতৃভূমিতে এলো! কিন্তু এখানে এসে যে ব্যবহার তারা পেতে লাগলো, তাতে তাদের মনে হতে লাগলো, তারা যেন এখানকার অনাহূত বা গায়ে পড়া অতিথি, কারণ গান্ধীজীর মত ছিল, তারা নিজেদের নিজেদের গ্রামে ফিরে যাক। নীচুতলার নেতারাও যখন গান্ধীজীর সুরে সুর মেলাতে লাগলো, তখন গান্ধীজীর ওপর উদ্বাস্তুদের তিরস্কার বা রাগ আরও তীব্র হতে লাগলো! (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৮)

উদ্বাস্তুদের ভাবনা ছিল এইরকম আবার এদিকে সাধারণ হিন্দুরা বিশেষ করে হিন্দু মহাসভার সমর্থকেরা ছিল গান্ধীজীর মুসলিম-তুষ্টিকরণ নীতির বিরোধী, তাদের মতে এই মুসলিম-তোষণ নীতির জন্যই হিন্দুস্থান বিভক্ত হল এবং গান্ধীজীই এর জন্য একমাত্র দায়ী, তাই গান্ধীজী ৫৫ কোটি টাকা দেবার জন্য এবং অন্য যে ৭টা শর্ত্ত পালনের জন্য অনশন করলেন—এরা তার কঠোর নিন্দা করল। শুধু তাই নয়, হিন্দু সভার এক নেতা শ্রী আশুতোষ লাহিড়ি স্পষ্টই জানালেন যে ঐ ৭টা শর্তের ওপর কোন হিন্দু নেতা স্বাক্ষর করবেন না! (অনুচ্ছেদ ১২ আই/৯)

হিন্দুসভার সমর্থন পেয়ে দিল্লীর উদ্বাস্তুরা আরও বেশী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তারা মিছিল বের করে গোষ্ঠীগত যুদ্ধনাদ্ (Slogan) দিয়ে তাদের রাগ ব্যক্ত করতে লাগলো! কিন্তু তাদের সেই প্রতিবাদ ছিল মাত্র মৌখিক। পুনের সাভরকরবাদী মহারাষ্ট্রীয়রা অশ্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তাদের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলো। গোপাল গোড়্সে তার সাক্ষ্যতে যা বলল, তাতেই বোঝা যায়, গান্ধীজীকে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে সরানো ছাড়া, হিন্দু এবং হিন্দুত্ব রক্ষা করার আর কোন উপায় নাই—এই ছিল তাদের মত ; আর হিংসা এবং অহিংসার তত্ত্বজ্ঞানের মানসিক দ্বিধা তাদের ছিল না বলেই এই রাজনৈতিক হত্যা কার্যকরী করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রথম চেষ্টা বিফল হল! কিন্তু দ্বিতীয় চেষ্টাতে তারা সফল হল! গোপাল গোড়্সে তাঁর কথনে (জবানীতে) একথাও স্বীকার করলেন যে যদি নাথুরাম গোড়্সে, নারায়ণ আপ্টে এবং তাঁদের সাথীরা সবাই

ধরা পড়ে যেতো, তা হলেও গান্ধী হত্যা হ'তই। এ থেকেই বোঝা যায় যে তাঁদের দলের মধ্যে "গান্ধী-বিরোধী" মত কত তীব্র ছিল এবং তাদের হত্যার পরিকল্পনা কত গভীর ছিল। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১০)

শ্রী জে. এন. সাহানী তাঁর সাক্ষ্যতে বললেন যে পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ উদ্বাস্তুদের গান্ধীজীর ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল। শুধু তাই নয় তারা গান্ধীজীর পূজাও করতো কিন্তু কয়েকটা ঘটনার জন্য তাদের শ্রদ্ধা কমতে লাগলো!

(ক) হিন্দুস্থান ছেড়ে না যাওয়ার জন্য, হিন্দুস্থান শাসক মুসলমানদের অনুনয় করতে লাগলো এবং যে সব মুসলমানরা ছেড়ে চলে গেছে তাদের ফিরে আসতে অনুরোধ করতে লাগলো। তাদের এই অনুনয় যোগ্য কি অযোগ্য, হয়তো যোগ্যও হতে পারে—তবুও—উদ্বাস্তুদের তা ভালো লাগলো না, কারণ মুসলমানরা যে সব ঘর-বাড়ী-বিপ্ণনী ফেলে গেছে বা যাবে তা হিন্দুদের পুনর্বাসনের কাজে লাগবে—এই ছিল তাদের বদ্ধমূল ধারণা!

(খ) পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি দেবার জন্য গান্ধীজীর অনশন এবং আকুলতা দেখে, তারা অবাক হ'ল এবং রাগান্বিত হতে লাগলো। কারণ তাদের বিশ্বাস এই যে হিন্দুস্থানের যে সব সৈনিক কাশ্মীর সংরক্ষণের কাজে রয়েছে, এই টাকা ব্যবহার করা হবে তাদের সংহারের জন্য!

(গ) হিন্দুস্থানের সমস্ত মুসলমানদের মত ও আগ্রহেই পাকিস্তান গঠন হওয়ায় হিন্দু এবং শিখদের মধ্যে নিজেদের সংরক্ষণ এবং অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার ভাবনা তৈরী হল এবং সেজন্যই সংগঠিত হবার, সংগঠন তৈরী করার পরিকল্পনা করল! আর সেই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১১)

তাছাড়া গান্ধীজীর প্রার্থনাসভার পরের উপদেশ ভাষণ হিন্দুদের ভাল লাগতো না! 'মুসলমানদের সংরক্ষণ দেওয়া হোক' এই একগুঁয়েমি গান্ধীজী সবসময় দেখাতেন, কিন্তু স্বাধীনতার জন্য যে সব হিন্দু, শিখ, সর্বস্ব জলাঞ্জলী দিল, তাদের উপর গান্ধীজী কোন সহানুভূতি দেখাতেন না!

এরা সব নিজেদের ঘর বাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়ে অবর্ণনীয় অত্যাচার, জ্বালানো-পোড়ানো এসব যন্ত্রনা সহ্য করে কোনরকমে দিল্লিতে এসে পৌচেছে। তাদের মনে আশা ছিল, এই তাদের মাতৃভূমি এখানে পুনর্বাসন হবে—এই ছিল তাদের আশা, কিন্তু তাদের সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হ'ল। "তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার নিয়ে, উপাস কর, ঠাণ্ডায় খোলা মাঠের মধ্যে থেকে কষ্ট কর"—এ ধরণের উপদেশ শোনবার মত মানসিক অবস্থা তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, যাদের জন্য তাদের আজ এত দুর্ভোগ, যে মুসলমানরা পাকিস্তান সৃষ্টি করল, সেই মুসলমানরাই হিন্দুস্থান শাসন থেকে সংরক্ষণ পাচ্ছে দেখে তারা তা সহ্য করতে পারল না! আর সেই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করল হিন্দু সহাসভার উগ্রপন্থী গোষ্ঠী—বিশেষ করে দক্ষিণের অর্থাৎ মহারাষ্ট্রের। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১২)

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা এবং হিন্দুস্থানের হিন্দু শিখ এবং তার মধ্যে হিন্দুসভার লোকেদের এই ধারণা হল যে, কংগ্রেসের মুসলমান তোষণ নীতির জন্যই পাকিস্তান সৃষ্টি হল। এবং সেখানকার হিন্দুদের গৃহহীন হয়ে, অবর্ণনীয় কষ্টের মুখোমুখি হতে হল। শুধু গান্ধীই নয় এই তোষণ নীতি অনেক ছোট ছোট কংগ্রেস নেতাদের ভাষণেও প্রকাশ পেতে লাগলো। তাদের তোষণ নীতি গান্ধীজীকেও ছাড়িয়ে গেল—জে. এন. সাহানী সাক্ষী নং ২৫। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১৩)

গান্ধীর চেলারা সমস্ত রকমের মিথ্যা সমাচার তাঁকে দিতে লাগলো—যথা, মুসলমানদের উপর অত্যাচার চলছে, 'উদ্বাস্তুরা আরামে আছে কারণ তাদের কাছে যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে এবং তারা অহেতুক শাসকীয় সাহায্য নিচ্ছে' ইত্যাদি এই সমস্ত অপপ্রচারে উদ্বাস্তুদের ক্রোধ বাড়তে লাগলো,—এদের ওপর ঘৃণা হতে লাগলো—বিদ্বেষও বাড়তে লাগলো, কারণ কংগ্রেসের কিছু কর্মী মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল—(নিজেদের রাজনৈতিক প্রয়োজনের স্বার্থে)। উদ্বাস্তুদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যিক চাহিদার দিকেও তারা উদাসীন ছিল। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১৪)

ন্যায়াধীশ কপুর, মতপ্রকাশ করেছেন যে, উল্লিখিত কারণের জন্য উদ্বাস্তুরা গান্ধীজীকে হত্যা করতে চেয়েছে—একথা মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তা নয়। গান্ধীজীর অন্যান্য মহৎ কাজের জন্য এবং হিন্দু শিখ ও অন্যদের বিপদের সময় যে সাহায্য করেছেন তার জন্য, তাদের, গান্ধীজীর ওপর অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। বিভাজনের পর, উদ্বাস্তুদের মনে যে উদ্বিগ্নতা দেখা দিল, তার চেয়ে, তাদের ঐ প্রেম ছিল অনেক বেশী। সাহানী বলেছেন, গান্ধীজীকে কোন শারীরিক আঘাত করার কথা তাদের মনে স্থান পাওয়াও ছিল অসম্ভব। কিন্তু লড়াকু সাভারকর সমর্থক মহারাষ্ট্রীয়রা এতই ক্রুদ্ধ হল যে তাদের পিস্তলের গুলিতেই সেই গান্ধীজীকে প্রাণ দিতে হল—যে গান্ধীজী "মহাত্মা" ছিলেন, "দার্শনিক" ছিলেন, "রাজনীতিজ্ঞ" ছিলেন, আর "এক গালে থাপ্পড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও"—এই মতের যিনি প্রবর্তক। (অনুচ্ছেদ ১২ আই/১৫)

"গান্ধীজীকে শারীরিক আঘাত করার কথা উদ্বাস্তুদের মনে আসা সম্ভব ছিল না"—ন্যায়াধীশ কপুরের এই মত বাস্তবভিত্তিক ছিল বলে মনে হয় না! কপুর প্রতিবৃত্তে উল্লেখ করা কয়েকজন সাক্ষীদের সাক্ষ্য এই প্রকার—

১৮ নং সাক্ষী ছিলেন দিল্লীর তখনকার পুলিশের উপ-আয়ুক্ত (Asst. Police Commisioner) শ্রী রনধাওয়া। তিনি তাঁর সাক্ষ্যতে বলেছেন যে, গান্ধীজীর অনশনের সময় উদ্বাস্তুরা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল বের করতো, ঐ মিছিলে "মরনা হ্যায়তো মরনে দেও"—এই উদ্‌ঘোষ (Slogan) দেওয়া হত। (অনুচ্ছেদ ১২ ই/১৪)

অনশনকালে এবং তার কয়েকদিন আগে পরে পরিস্থিতি খুব উদ্বেগ-পূর্ণ ছিল। সর্বত্র হৈচৈ। উদ্বাস্তুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিল। তারা দলে দলে বিড়লাভবনের সামনে জমা

হ'ত আর "গান্ধীকো মরনে দেও"—উদ্‌ঘোষ (Slogan) দিত। এর আংশিক কারণ গান্ধীজীর ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়ার আগ্রহ এবং অন্যান্য কারণ হচ্ছে উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে উদাসীন থেকে, তাদের সাহায্য না করে, মুসলিমদের সাহায্য করার নীতি ইত্যাদি। (অনুচ্ছেদ ১২ই/২৫)

এই প্রতিবৃত্তের ১৬৬ পৃষ্ঠায় (অনুচ্ছেদ ১২ সি/২৯) এ ন্যায়াধীশ শ্রী কপুর এই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, যে সব উদ্বাস্তুরা আসছিল তাদের সম্বন্ধে পণ্ডিত নেহেরু বা অন্যান্য মন্ত্রীদের সহানুভূতি ছিল না, অথবা তাঁরা উদ্বাস্তুদের বিরোধী ছিলেন—এ ধরণের মতের সঙ্গে তদন্ত সমিতি সহমত নয়, কিন্তু গান্ধীজী যখন প্রার্থনা সভার পর সহানুভূতিবিহীন উপদেশ দিতেন তখন তারা গান্ধীজীর ওপর ক্রুদ্ধ হত। তাদের আরও ধারণা ছিল এই যে, "গান্ধীজী মানেই কংগ্রেস, আর কংগ্রেস মানেই গান্ধীজী।" গান্ধীজী যখন একথা বলতেন যে, "তোমরা নিজেদের নিজেদের গ্রামে ফিরে যাও" তখন তারা গান্ধীজীর ওপর আরও বেশি বেশি রেগে উঠতো। যতই ত্যাগ করতে হোক না কেন, কোন অবস্থাতেই তারা ফিরে যেতে রাজী ছিল না। সেখানকার তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের ছিল এবং পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং অধিকারীদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর এবং জঘন্য ব্যবহার ছাড়া অন্যরকম ব্যবহার পাওয়া যাবে বলেও তাদের বিশ্বাস ছিল না! মুজাহীদ, রজাকার, মুসলিম লীগের কর্মকর্তা এবং সেখানকার অধিকারীরা উদ্বাস্তুদের সম্মানের সহিত স্বাগত করবে একথা তারা আশা করতে পারছিল না। আর সেজন্যই তাদের মনোবাসনা এই ছিল যে, তারা যেমন নিজেদের দেশে চলে এসেছে। তেমনি মুসলমানরাও, নিজেদের জন্য নির্মাণ করা দেশে অর্থাৎ পাকিস্তানে চলে যাক্, এই চিন্তা, যোগ্য কি অযোগ্য তা স্থির করা এই তদন্ত সমিতির (Commission) আওতায় নেই অথচ উপরিউক্ত মনোভাব উদ্বাস্তুদের বেশীমাত্রায় ছিলো এবং তা তীব্র হোলো, গান্ধীজীর অনশনে। সেই তীব্রতা আরও বাড়লো পাকিস্তানকে ৫৫ কাটি টাকা দেওয়াতে। হিন্দুদের মতে এ ছিল (৫৫ কোটি প্রদান) অত্যন্ত জঘন্য কাজ। কারণ এই টাকা হিন্দুস্থানের সেই সৈনিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার শুধু সম্ভাবনাই ছিল না—একেবারে নিশ্চিত ছিল। যারা কাশ্মীরের সংরক্ষণের জন্য তখন লড়ছিল!

ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তে, বিশেষ করে উদ্বাস্তুদের ভাবনা বর্ণনা করেছেন! তা গান্ধীজীর বিরুদ্ধে ছিল কি ছিল না তাও উপরোক্ত প্রতিবৃত্তের দ্বারাই প্রমানিত হয়।

ন্যায়াধীশ কপুরের আগে বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ডঃ পাঠক এই তদন্ত সমিতির মুখ্য ছিলেন, তার সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় শ্রী বৃজকৃষ্ণ চান্দীওয়ালা (১১ নং সাক্ষী) বলেছেন ১৯৪৭ সালে দিল্লিতে হিন্দু-মুসলমানদের দাঙ্গা (Riot) চালু ছিল। সাথে সান্ধ্য আইনও চালু ছিল। অনেক হত্যা হল। চান্দীওয়ালা এই খবর নিয়মিত গান্ধীজীর কানে পৌঁছে দিতেন। এবং তিনিই গান্ধীজীকে কলকাতা থেকে ডেকে আনবার বন্দোবস্ত করলেন। তার মতে গান্ধীজী না এলে দিল্লীর রাস্তায় রাস্তায় এর চেয়েও বেশী হত্যা কাণ্ড

হত। গান্ধীজী আসায় শান্তি স্থাপন হল সত্য কিন্তু পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুরা ক্ষুব্ধ হোলো আরও বেশী! কোন এক কারণে গান্ধীজী কিংসওয়ে শিবিরে গেলে উদ্বাস্তুরা তাকে অনেক কড়া শব্দ শোনালো! আস্তে আস্তে এই ক্রোধের মাত্রা বাড়তে লাগলো এবং এরপরে গান্ধীজীর নামে ধমকী ও অভদ্র ভাষা ব্যবহার করে অনেক পত্র আসতে লাগলো! সেই পত্র চান্দীওয়ালা পড়তো! একবার চান্দীওয়ালা গান্ধীজীর, উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করায় সেই সাক্ষাতকারে উদ্বাস্তুরা গান্ধীকে মুখের উপর অভদ্র ভাষা শোনালো! আর একদিন বিড়লা ভবনের সামনে এক মিছিল এসে হাজির হল! মিছিলের লোকেরা উদ্‌ঘোষ (Slogan) দিচ্ছিল "খুন কা বদলা খুন সে লেঙ্গে" গান্ধীজী ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেবার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করেছিল, এরা তার বিরোধী ছিল! সেই সময় নেহেরু গান্ধীজীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি বাইরে এসে মিছিল শান্ত করলেন, তা না হলে সেদিন গান্ধীজীকে শারীরিক আঘাত করা হত। শ্রী বৃজকৃষ্ণ চান্দীওয়ালার এই সাক্ষ্য ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তের প্রথম খণ্ডে ১৪০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেছেন।

১৪১ পৃষ্ঠায় অনুচ্ছেদ ১২এ/৩৪-এ, ১৯৪৮ এর ১৫ই জানুয়ারীর "Times of india" পত্রিকার একটা বার্তা উদ্ধৃত করা হয়েছে। সে বার্তায় ছিল—"কিছু লোক বিড়লা ভবনের ফটকের সামনে জমা হল—গান্ধীকো মরনে দেও"—উদ্‌ঘোষ (Slogan) দিতে লাগলো। ঐ সময় ভেতরে গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, মৌলানা আজাদ বসে কথাবার্তা বলছিলেন, নেহেরু "গান্ধীকো মরনে দেও"—শুনেই বাইরে ছুটে এলেন। চিৎকার করে বলতে লাগলেন, "এ ধরণের উদ্‌ঘোষ (Slogan) দেওয়ার সাহস তেমাদের হয় কি করে, আগে আমাকে মারো।" তারপর সব বিক্ষোভকারীরা ধীরে ধীরে চলে গেলো।

এই সংবাদ থেকে ন্যায়াধীশ কপুর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে উদ্বাস্তুরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে বলে শ্রী চান্দীওয়ালা যা বলেছেন, 'Times of India'র খবর থেকে তা সত্যি বলে মনে হয়, তবে নেহেরু না এলে গান্ধীজীকে শারীরিক আঘাত করা হত বলে শ্রী চান্দীওয়ালা যে মত প্রকাশ করেছেন, 'Times of India'-র সংবাদ তা প্রমান করে না!

যাই হোক না কেন, "উদ্বাস্তুদের যত অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে, সেই যন্ত্রণার থেকেও গান্ধীজীর ওপর প্রেম ছিল অনেক বেশী"—ন্যায়াধীশ কপুরের এই বক্তব্য অবাস্তব বলে মনে হয়, তাছাড়া উদ্বাস্তুরা এই চরম অবস্থায় পৌঁছাতো কিনা—মদনলাল ছিল তার জ্বলন্ত প্রমান।

মদনলাল ছিল এক ভুক্তভোগী উদ্বাস্তু। সে নিজেও এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে গান্ধী হত্যার যে সব কারণ ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তে উদ্ধৃত করেছেন আর নাথুরাম গোড়সে যে সব কারণ দিয়েছেন তা প্রায় একরকম এবং দিল্লীর উদ্বাস্তুদের নাথুরামের দেখা শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি যা নাথুরাম বর্ণনা করেছেন আর ন্যায়াধীশ কপুরের দেওয়া বর্ণনা অভিন্ন!

"কালায় তস্মৈ নমঃ"

"সর্দার প্যাটেল ও ৫৫ কোটি"

সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের কন্যা শ্রীমতি মনিবেন, কপুর সমিতির সামনে সাক্ষ্য দিয়েছেন ; শ্রীমতি মনিবেন এর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারীর দিনলিপি (Diary) থেকে পাওয়া যায় যে ১৩ই জানুয়ারী শ্রী মথাই চেট্টি, পণ্ডিত নেহেরু এবং গান্ধীজীর সাথে সর্দ্দার প্যাটেল ৫৫ কোটি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। গান্ধীজীর চোখে জল ভরে এলো দেখে, সর্দ্দার প্যাটেল দুঃখিত হলেন, পরে বললেন, "এরপর আমার পক্ষে মন্ত্রিমণ্ডলে থাকা সম্ভব হবে না!" (পৃষ্ঠা—১৮২)

মদনলালের দেওয়া জবানী (Police statement) সর্দ্দার প্যাটেলকে জানানো হয়েছিল বলে শ্রীমতি মনিবেন স্বীকার করেছেন। (পৃষ্ঠা—১৮০)

ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে যখন যখন যা কিছু জানা যেতে লাগলো, তা আমার বাবাকে জানানো হতে লাগলো, সে বিষয়ে কি করা হবে বা কি করা হবে না এরকম কোন নির্দ্দেশ আমার বাবা দিয়েছিলেন কিনা আমার মনে নেই। কোন নিশ্চিত প্রমান না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে দেশের প্রতিরক্ষার কারণে আটক করার কোন আদেশ আমার বাবা দেননি। (My father would not order the arrest of anybody, unless he had positive proof that the arrest was for the protection of the country)। (পৃষ্ঠা—১৭৯)

আমার স্পষ্ট মনে আছে গান্ধীহত্যার দিন পনের আগে একদিন ভোর ৫ টার সময় একজন সম্পাদক আমার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন—যাঁর সংবাদপত্র থেকে প্রতিভূ (জামিন) চাওয়া হয়েছিল, তখন অন্ধকার ছিল বলে চিনতে পারিনি—কিন্তু তিনি তাঁর সংবাদপত্র থেকে চাওয়া অঙ্গীকার পত্র সম্পর্কে কথা বলছিলেন, তা আমার মনে আছে, আর মোরারজী দেশাই তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন, এই অভিযোগও তিনি করছিলেন। (পৃষ্ঠা—১৭৯)

নাথুরাম তখন দিল্লিতে ছিল। নানা আপ্‌টেও ছিল। তাদের সংপাদপত্র থেকে বারবার প্রতিভূ চাওয়া হচ্ছিল। শ্রী মোরারজী দেশাই-এর বিরুদ্ধে তাদের ঘোর অভিযোগও ছিল, এ সবকিছু শ্রীমতি মনিবেন এর সাক্ষ্যর সাথে মিলে যাচ্ছে—একথা সত্য, কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ সর্দ্দার প্যাটেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল বলে তারা কেউই আমার কাছে (এই বইয়ের লেখক-এর) কোনদিন বলেনি, কাজেই নাথুরাম কিংবা আপ্‌টে এদের মধ্যে কেউ সর্দ্দার প্যাটেলের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল কিনা

তা শ্রীমতি মনিবেন বর্ণিত অন্ধকারে না দেখতে পাওয়া লোকটির মত অন্ধকারেই রয়ে গেলো!

ন্যায়াধীশ কপুর তার প্রতিবৃত্তের ১৮৫ পৃষ্ঠায় শ্রী রাজাগোপাল আচারীর লেখা "Gandhiji's Teaching and Philosophy" বই-এর উল্লেখ করেছেন। রাজাজী তাঁর বই-এর ২১ এবং ২২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ১৯৪৮-এর ৩০শে জানুয়ারী নাথুরাম, গান্ধীজীকে হত্যা করল। সর্দ্দার প্যাটেলের মনে হল যে, যে সময় পাকিস্তান আমাদের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক সেইসময় গান্ধীজী ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেবার জন্য যে চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন, সেই জন্যই হিন্দুরা গান্ধীজীর ওপর ক্রোধান্বিত হল! আর তা থেকেই সৃষ্টি হল গান্ধী হত্যার পরিকল্পনা। ঐ সময়ে ৫৫ কোটি টাকা দিয়ে, শত্রুকে সাহায্য করার যে মূর্খতা শাসন করেছিল, এদের কাছে তা ক্ষমাহীন বলে মনে হল এবং গান্ধীবিরোধী মহারাষ্ট্রের চরমপন্থী দলের লোকেদের মনে হল গান্ধীজীর এই কাজ দেশকে সর্বনাশের চরম সীমায় পৌছে দেবে, তাই তারা এই মহান ঋষিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল। কারণ তাদের মনে হয়েছিল যে অন্য কোন উপায়ে গান্ধীজীকে নেতৃত্ব থেকে সরানো যাবে না! কারণ গান্ধীজীর প্রতিপত্তি এত বেশী ছিল আর মানুষ অন্ধের মত গান্ধীকে এত মানতো —তারা বুঝলো এ দেশের কারোর পক্ষে গান্ধীজীর মতের বিরোধ করা সম্ভব না! সর্দ্দার প্যাটেলের মতে এই ষড়যন্ত্র যারা করল তাদের মনে হয়েছিল "গান্ধীজীকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।" (পৃষ্ঠা—২৮৫, অনুচ্ছেদ ২ ই/২)

যে কারণে নাথুরাম গান্ধী হত্যা করল, ঠিক সেই কারণ বল্লভ ভাই, তখনই রাজাজীর কাছে কি করে প্রকাশ করলেন এ রহস্য ভেদ করার মত কোন প্রমান এই লেখকের কাছে নেই, শুধু কিছু আন্দাজ করা যেতে পারে। সেই আন্দাজ যতটা পাঠকবর্গ করতে পারবেন, ততটাই এই লেখকও— এর বশী নয়।

“ধর্মান্তর—
মানেই রাষ্ট্রান্তর।”
—বীর সাভারকর

"কাশ্মীর"

শ্রী ভি. পি. মেনন, তাঁর "The Story of Integration of The India States" বইয়ের ৪১৩ পৃঃ লিখেছেন—"যে রাষ্ট্র নিজেদের ইতিহাস অথবা ভূগোলের দিকে ফিরে তাকায় না তার সর্বনাশ অনিবার্য," কাশ্মীরের ওপর আক্রমণ হল, কাশ্মীরের মহারাজা হিন্দুস্থানের কাছে প্রতিরক্ষার প্রার্থনা জানালেন, কাশ্মীর হিন্দুস্থানে বিলীন হবে বলে শ্রী মেনন পরামর্শ দিলেন! চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীদের এই আক্রমণ মানেই "যেটুকু হিন্দুস্থান বেঁচে আছে তাও আবার টুকরো হবার ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা" এই চিন্তা করেই শ্রী মেনন কাশ্মীর বিষয়ে শাসনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সর্দ্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল তখন উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং গৃহমন্ত্রী ছিলেন। শ্রী মেনন বল্লভ ভাইয়ের মুখ্য সচিব ছিলেন। যে সব রাজ পরিবার হিন্দুস্থান অথবা পাকিস্তান কোথাও যোগ দেয়নি বিভাজনের পর তাদের রাজ্য বিলীনের ব্যাপারে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কাজেই তাঁর পরামর্শের গুরুত্ব ছিল!

মহম্মদ্ গজনীর সময় থেকে, মানে অষ্টাদশ শতাব্দীর আগে থেকে পশ্চিম উত্তর (বায়ু) কোন থেকেই বারবার হিন্দুস্থানের ওপর আক্রমণ হচ্ছিল। মোগল শাসনের কয়েকটা বছর ছিল এর ব্যতিক্রম। মহম্মদ্ গজনী নিজে ১৭ বার হিন্দুস্থান আক্রমণ করেছিল। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার ৬ সপ্তাহের মধ্যেই ঐ উত্তর-পশ্চিম সীমা দিয়ে আক্রমণকারীর দল নির্ব্বিবাদে প্রবেশ করছিল, আজ শ্রীনগর তো কাল দিল্লীও হতে পারে। তাই মেননের মত হল "A Nation that forgets it's history or it's geography does so as it's peril."

কাশ্মীরের ইতিহাস লেখন বিষয়ে Dr. Sten বলেছেন—মুসলিম আক্রমণের আগে থেকেই পরস্পরাগত এবং নিয়মিতভাবে ইতিহাস লেখার কাজ হিন্দুস্থানের কোথাও যদি হয়ে থাকে—তা হলো কাশ্মীরে ("The Valley of Kashmir" by Walter Lawrence, London 1895)। কাশ্মীর হিন্দুস্থানের শীর্ষে,ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে বৌদ্ধ কিংবা অন্য হিন্দু রাজাদের রাজত্ব ছিল। তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা কল্হনের "রাজতরঙ্গীনি" এই সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায়। কল্হনের কাজের ধারা পণ্ডিত জোনারাজা পনের 'শ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত বহন করে গেলেন!

হিন্দু শাসনকালে রাজ্য শাসনের সাথে সাথে সুন্দর সুন্দর মন্দির ও লোকহিতকর বাস্তুশিল্প তৈরী হল। তার মধ্যে অনন্ত নাগ ব্রিজ বিহারা, পাণ্ডুপট্টন, শঙ্করাচার্যপট্টন,

মার্তণ্ড প্রভৃতির অবশেষ আজও রয়ে গেছে। এই থেকে বোঝা যায় যে সেখানে ঘন লোকবসতি ছিল এবং হিন্দুরাজাদের আধিপত্যে, হিন্দুপ্রজারাও সুখী ছিল, যে সব খাল ও বাঁধ আছে তা দেখে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে রাজারা সম্পত্তির ব্যবহার শুধু মন্দির তৈরী করার কাজে লাগান নি। কৃষিকাজের বিকাশের দিকেও তাদের লক্ষ্য ছিল!

তের'শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাতাররা কাশ্মীর রাজার উপর আক্রমণ করল, তখন রাজার সেনাপতি সাহায্যের জন্য "স্বাত"-এর শাহ্নী এবং "তিব্বতের" রায়চন্দ শাহকে ডেকে পাঠালেন। রায়চন্দ শাহ শক্তিশালী ছিল। সে এসে সেনাপতিকে হত্যা করে তার মেয়ে কুটরানীকে বিয়ে করল। রাজ্যও অধিকার করল কিন্তু নানা কারণে এই রায়চন্দ শাহ মুসলমান ধর্ম স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে 'সদ্‌রুদ্দিন' এই নাম ধারণ করল। (পাঞ্জাবের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী জগমোহনের " My Frozen Turbulence in Kashmir"এই বইতে 'সদ্‌রুদ্দিন' এর পূর্বকালীন নাম 'রিচানা' ছিল বলে উদ্ধৃত আছে—অনুবাদক)

সদ্‌রুদ্দিনের মৃত্যুর পর 'স্বাত' এর মীর শাহা কাশ্মীর আক্রমণ করে তা হস্তগত করল। কাশ্মীরের সেই হল প্রথম সুলতান!

পরম্পরা অনুসারে ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর নামক সুলতান গদীতে বসল। সে প্রচণ্ড মূর্তি বিদ্বেষী ছিল! কিন্তু যাকে ধর্ম বলা হয় সেই ইসলামের সে বৃদ্ধি করল কি ভাবে? হিন্দুদের সামনে তিনটে বিকল্প রাখলো, ধর্মান্তর, দেশত্যাগ অথবা মৃত্যু। যারা ধর্মান্তর গ্রহণ করল না, অথচ দেশত্যাগও করল না এমন যজ্ঞোপবীত ধারী কিংবা পণ্ডিত, সে কতজন হত্যা করল? তার হিসাব Lawrence তাঁর বই-এ দিয়েছেন, সংখ্যা দিয়ে গোনা সম্ভব নয়। তাই শিরোচ্ছেদ করার পর সেই হিন্দুদের যজ্ঞোপবীত একত্রিত করা হল,—তার ওজন হল ৭ মন। সংখ্যা লিখে তারপর কতগুলো শূন্য দিয়ে লম্বা চওড়া একটা রাশি বলা বা মনে রাখার চেয়ে গোনবার বা মনে রাখবার এটা কত সহজ উপায়, সেই যজ্ঞোপবীত পোড়ানো হল! হিন্দুশাস্ত্রে বিদ্যাভাসের জন্য কয়েক পুরুষ ধরে যত্ন করে রাখা গ্রন্থ এই সুলতান ডাল সরোবরে ডুবিয়ে নষ্ট করল। ধ্বংস বা বিনাশ যে ইসলাম ধর্মে "ধর্মকৃত্য" বলে মানা হয় সেই ইসলাম ধর্ম ও সেই সংস্কৃতি এইভাবে বাড়তে লাগলো।

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে আকবর, কাশ্মীরে মোগল শাসন চালু করল, মোগলরা রমনীয় আবহাওয়ার জায়গা বলে প্রায় ২০০ বছর উপভোগ করলো।

১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আহমদ্‌ শা-আব্‌দালী হিন্দুস্থান আক্রমণ করলো এবং কাশ্মীর হস্তগত করল। কারণ ততদিনে মোগলদের শক্তি কমে গিয়েছিল। পরে প্রায় ৭০ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর পাঠান আধিপত্যে ছিল!

পাঠানদের রাজ্যশাসন কালে এইরকম কোন কোন ক্ষেত্রে এর চেয়েও ভীষণ নিষ্ঠুর কার্যক্রম চালু রইল। আজাদ খান নামক পাঠান প্রশাসকের "হিংস্র" "বাতিক" কি

ছিল? ব্রাহ্মণদের জোড়ায় জোড়ায় ঘাসের বস্তায় ভরে ডাল সরোবরে ডুবিয়ে মারা, সে জিজিয়াকরও আবার চালু করল। মীর হজর নামক পাঠান প্রশাসক আজাদ খানের পদ্ধতির একটু পরিবর্তন করলো। ঘাসের বস্তার বদলে সে চামড়ার বস্তা ব্যবহার করতে লাগলো। সিয়াপন্থী মুসলমানদের ওপরও সে এইভাবে অত্যাচার করেছে বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। তারপর এলো মহম্মদ খান, মহম্মদ খান অত্যাচার করতো বেশী মেয়েদের উপর। তার হাত থেকে নিজেদের ঘরের মেয়েদের রক্ষা করতে হিন্দুরা মেয়েদের সৌন্দর্য নষ্ট করার জন্য তাদের মাথা মুড়িয়ে ফেলতো এবং তাদের নাকও কেটে ফেলতো। দিনের পর দিন এইসব ভয়ঙ্কর অত্যাচার কাশ্মীর সহ্য করতে থাকলো, যে কিছু হিন্দু টিকে রইল তা কাশ্মীর আবার হিন্দুদের আধিপত্যে এলো বলেই!

মহারাজা রঞ্জিত সিং নামক বীর শিখ রাজা ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদের হাত থেকে পাঞ্জাবের মত কাশ্মীরও মুক্ত করলেন। তারপর ১৮৪৬ পর্যন্ত কাশ্মীর ঐ শিখ রাজা অথবা তাঁর প্রশাসকদের আধিপত্যে রইল।

কাশ্মীরের এক ভাগ জম্মু—১৭৫০ থেকে রঞ্জিত দেব নামক রাজপুত বংশীয় ডোগ্‌রা রাজার অধীনে ছিল। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রঞ্জিত দেব মারা গেলেন। রঞ্জিত দেবের বংশের তিনজন, গুলাব সিং, ধ্যান সিং ও সুচেত্ সিং-এরা মহারাজা রঞ্জিত সিং-এর অধীনে সেনাধিকারীর কাজ করেছিল। তাদের বীরত্বের প্রতিদান হিসাবে রঞ্জিত সিং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে গুলাব সিংকে জম্মুর রাজা করলেন। চিম্বল ও পুঞ্চ, কাশ্মীরের এই অংশের রাজ্যাধিকার দিলেন ধ্যান সিংকে ও সুচেত্ সিংকে রামনগরের রাজত্ব দিলেন! ধ্যান সিং এবং সুচেত্ সিং পরে যুদ্ধে মারা গেলে গুলাব সিং এর হাতে সম্পূর্ণ ভাগের অলিখিত আধিপত্য এলো!

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ইংরেজ ও শিখ রাজাদের লড়াইয়ে ইংরেজ জয়ী হল। ইংরেজ তখনকার শিখ শাসনকর্তার কাছ থেকে পাঞ্জাবের এক বৃহৎ অংশ এবং এক কোটি টাকা দাবী করল! রাজা ব্যাস (বিয়াস) নদী থেকে সিন্ধু নদী পর্যন্ত কাশ্মীর সহিত সম্পূর্ণ অংশ দিতে রাজী হলেন! কারণ এক কোটি টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তখনকার গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জ তা নিতে অস্বীকার করলেন, কারণ তার বিচারে এই পার্বত্য ভাগের সংরক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখা, লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। গুলাব সিং সেই এক কোটি টাকা দিতে এগিয়ে এলেন! তিনি অনুবন্ধ (শর্ত) রাখলেন যে জম্মু এবং কাশ্মীর স্বতন্ত্রভাবে তাঁর হাতে দিতে হবে।ইংরাজ তাতে রাজী হলো! ১৬ই মার্চ ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরে এই চুক্তি হল! জম্মু এবং কাশ্মীর এই ভাবেই এক স্বতন্ত্র রাজ্যে পরিণত হল!

জম্মু কাশ্মীরের দক্ষিণে। পূর্বদিকে লাদাক উত্তরে বাল্টিস্থান তারপর হুঞ্জা ও নাগীর, পশ্চিমে গিলগিট্, মুজাফরাবাদ, রৈসো, পুঞ্চ, মীরপুর। ক্ষেত্রফল ৮৪৪৭১ বর্গমাইল। ১৯৫১ লোক গণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৪৩৩৭০০০!

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৩০০ 'শ শতাব্দীর মুসলমান আক্রমণের পর থেকে মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে থাকলো। (Danger in Kashmir—Joseph Carbel page 11) ধর্মভ্রষ্ট করা, মেয়েদের জোর করে নিয়ে যাওয়া এসব কয়েক'শ বছর ধরে চলছিল। তাই যখন হিন্দুস্থান স্বাধীন হল—তখন যদিও ঐভাগ হিন্দুরাজার আধিপত্যে ছিল তবুও হিন্দু সাংস্কৃতিক ভিত্তি বিপর্যস্ত, বলতে গেলে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫১-র লোকগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যার ৭৭ ভাগ ছিল মুসলমান।

জোসেফ কার্বেল তাঁর লেখা "ডেনজার ইন কাশ্মীর"-এ লিখেছেন (পৃষ্ঠা-১৫)—বিপর্যস্ত সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার এবং হিন্দুধর্মের পুনঃস্থাপন করার জন্য উনিশ শতকের মাঝামাঝি রাজা পুনঃসংস্কৃতিকরণ এবং শুদ্ধি করণের চেষ্টা করলেন। কিন্তু বারানসীর পণ্ডিতগণ তাঁর বিরোধ করলেন!

"অনেক বছর ধরে পাঠান এবং অন্য বিদেশী ও মুসলমানদের রাজত্বে থেকে পিষ্ঠ হয়েছি, ছলে বলে আমাদের মুসলমান করা হয়েছে। আমরা পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যেতে চাই, আপনি হিন্দুরাজা, কাশ্মীরে রাজত্ব করছেন, তাই আমাদের হিন্দুধর্মে পুনঃ প্রবেশের অনুমতি দিন! আপনি যা আদেশ করবেন সেই প্রায়শ্চিত্ত স্বীকার করে আমরা হিন্দু হতে চাই"!—এইরকম লিখিত আবেদন পত্র রাজার কাছে আসতো। অনেক পরিবার হিন্দুধর্মে পুনঃপ্রবেশ করতে ইচ্ছুক ছিল। রাজা কাশ্মীর পণ্ডিতদের কাছ থেকে ধর্মের বিধান জানতে চাইলেন। তারা অনুকূল মত দিলেন না! রাজা শুদ্ধিকরণের চেষ্টা করলেন, তিনি ঘোষণা করলেন "যাঁরা আগে হিন্দু ছিলেন এবং পুনরায় হিন্দু হতে চান, এ ধরণের প্রজাদের আমি এক বড় যজ্ঞ করে হিন্দু করে নেবো! রাজা হিসাবে এই অধিকার আমার আছে!"

কিন্তু রাজপুরোহিতেরা বাদ সাধলেন, তারা রাজাকে ভয় দেখালেন এই বলে যে এ ধরণের অধর্ম করলে তাঁরা আত্মহত্যা করবেন। এবং সত্যিই তাঁরা বিতস্তা (ঝিলম) নদীর প্রবাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রাজা তাঁদের বাঁচালেন এবং যজ্ঞ স্থগিত রাখলেন। কাশ্মীরের সেইসব নাগরিক মুসলমানই রয়ে গেল! (আবার পাকেচক্রে ঐ প্রত্যাখ্যাত নাগরিকরাই পরবর্ত্তী পর্যায়ে আরও বেশী হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে গেলো)

শ্রী বালশাস্ত্রী হরদাসের লেখা (ডঃ মুঞ্জের চরিত্রের) প্রথম ভাগে ৫৯ পৃষ্ঠায় এ ঘটনার উল্লেখ আছে!

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণপঠন-পাঠন বিদ্যায় অভ্যস্ত সেই তথাকথিত বিদ্বানদের সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী ধর্ম এবং রাষ্ট্রের হানিকারক হল! এখানে শ্রী ভি. পি. মেননের লেখা আবার মনে পড়ে—"নিজেদের ইতিহাস এবং ভূগোল যারা ভুলে যায় তাদের রাষ্ট্র ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়।" বর্তমান শিবসেনা প্রধান শ্রী বালঠাক্‌রের পিতা এবং 'প্রবোধন,' পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় কেশব ঠাক্‌রে ১৯২৮-এ লেখা তাঁর পুস্তকে কিছু উদাহরণ দিয়েছেন। আলাউদ্দিন খিলজীর সেনাপতি এবং হিন্দু বিনাশকারী, মালিক কাফুর

রাজপুত পরিবারে জন্মেছিল—এরকম অনেক উদাহরণ তিনি দেখিয়েছেন। এই ধর্মান্তরিত প্রাক্তন হিন্দুসন্ততিদের ইসলাম প্রণালীর সংস্কারে তৈরী করা হয়েছে, তারা কেউ হিন্দু প্রেমী রইল না! অথবা আজকের ভাষায় "স্যেকুলার"ও হল না! কোরাণোক্ত প্রণালীতে ইসলামের বৃদ্ধি ও প্রসার করার জন্য তারা হিন্দুদের "কোতল" করা থেকে শুরু করে মেয়েদের লুট করা পর্যন্ত সবরকম পদ্ধতি ব্যবহার করল!

এইরূপ প্রক্রিয়ায় ধর্মান্তর রাষ্ট্রান্তরে পরিণত হতে থাকলো। আমাদের তথাকথিত ধর্মগুরুরা নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেলেন, ভূগোল ভুলে গেলেন! শুদ্ধিকরণের বিরোধিতা করে তারা বিনাশের রাস্তা প্রশস্ত করে দিলেন!

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গুলাব সিং মারা গেলেন। তাঁর পুত্র ১৮৮৫ পর্যন্ত রাজ্য চালালেন, তারপর ১৯১৫ পর্যন্ত ছিলেন প্রতাপ সিং। ১৯১৫ সালে মহারাজা হরি সিং সিংহাসনে বসলেন!

হিন্দুস্থানের আন্তরাষ্ট্রীয় সীমার দিক থেকেও কাশ্মীরের গুরুত্ব অনেক। কাশ্মীরের সীমা পূর্বদিকে তিব্বত পর্যন্ত। উত্তরের দিকে চীনের লিচিয়াং ভাগ এবং উত্তর পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান পর্যন্ত। আফগানিস্থানের দুবেলকেগিলগিটের উত্তরে অবস্থিত বাখান। মিনতাকা খিণ্ডির উপর দিয়ে যাওয়া গিলগিট্ খাশগার রাস্তার পশ্চিমে রয়েছে রাশিয়া ব্যাপ্ত তুর্কস্থান!

রাজা হিন্দু ছিলেন। ইসলামের নামে রাজার প্রতিও কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তার উদাহরণ শ্রী ভি. পি. মেননের পূর্বোক্ত পুস্তকে পাওয়া যায়। এই বইয়ের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় লেখা উদাহরণ পাঠকদের অবগতির জন্য দেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তান নির্মাণের মাস দুই পরে ১৯৪৭ এর ২২শে অক্টোবর পাকিস্তানের চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী দ্বারা কাশ্মীর আক্রান্ত হ'ল। কাশ্মীরের নিজস্ব সৈন্য ছিল। সেই সৈন্য ছিল মুজাফরাবাদে, নারায়ণ সিং ছিলেন সেই বাহিনীর প্রধান। সেই সৈনিকরা ছিল মুসলমান এবং ডোগরা। তাদের বেতন দিতেন কাশ্মীর রাজা। যখন আক্রমণ হল, তখন বাহিনীর মুসলমান সৈনিকরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে গেল! তারা পালিয়ে গিয়ে আক্রমণকারী চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে গেল। শুধু তাই নয়—তারা আক্রমণকারী মুসলিমদের মার্গদর্শক হল এবং সমস্ত গোপন জায়গা তাদের দেখিয়ে দিল! যাবার সময় তারা বাহিনীর প্রধান এবং উপপ্রধানকেও হত্যা করে গেল!

মুসলিম সমাজ কিরকম আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে, ইচ্ছাকৃতভাবে সেদিকে লক্ষ্য না দিয়ে কিংবা হিন্দু সাধারণের কাছ থেকে তা লুকিয়ে রেখে আমাদের কংগ্রেস নেতারা মানুষকে, হিন্দু-মুসলিম একতার ভাঁওতাবাজিতে ভুলিয়ে রেখেছিল। কাশ্মীরের হিন্দু সেনাধিকারীর উপরেও সেই মিথ্যা প্রচারের প্রভাব পড়েছিলো! আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে, আক্রমণকারীরা মুসলমান, তাদের আক্রমণ ধর্মের নামে "জেহাদ" হিসাবে! এই অবস্থায় কাশ্মীরের মহারাজা লেঃ কঃ নারায়ণ সিংকে যখন

জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার সেনাবাহিনীর অর্দ্ধেক সৈনিক মুসলমান—যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থায় মুসলমান সৈনিকরা তোমার আদেশ মানবে কি? তাদের নিষ্ঠার উপর তোমার ভরসা আছে কি?" সেনাপতি সাথে সাথেই উত্তর দিলেন "মহারাজ—আমার এবং এই সৈনিকদের সম্পর্ক দুই একদিনের নয়, কয়েক বছরের। ডোগরা সৈনিক আমার কাছে যতটা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়, তার চেয়েও এই মুসলমান সৈনিকরা বেশি বিশ্বাসযোগ্য"। নিজের অনুমান ভুল হয়েছে—এ কথাটা স্বীকার করার সুযোগও ওই বিশ্বাসঘাতক সৈন্যরা সেনাপতি নারায়ণ সিংকে দেয়নি। যাবার সময় তারা লেঃ কঃ নারায়ণ সিংকে নিদ্রিত অবস্থায় হত্যা করে গিয়েছিল!

কবে একদিন, যে ধর্মান্তর হয়েছিল তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেই ধর্মান্তর কি করে, কোন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রান্তরে পরিণত হল! তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ!

১৯৩০/৩২ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি শেখ্ আবদুল্লার নেতৃত্বে অখিল জম্মু কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স এর মুসলমানদের অধিকার পাইয়ে দেবার আন্দোলন শুরু হল! পরিকল্পনা অনুসারে অনেক দাঙ্গা হল। ধূর্ত শেখ্ আবদুল্লা ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ধর্ম নিরপেক্ষতার মুখোশ ধারণ করল। এবং হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে মুসলমানের এই আন্দোলন, গান্ধীজীর প্ররোচনায় কংগ্রেসের হিন্দু অংশে সমর্থন লাভ করল। শেখ অবদুল্লা "স্যেকুলারিজমের" কাশ্মীরী উদ্যোক্তার সম্মান পেল। তার শুরু করা 'দল' ও আবশ্যিকভাবে 'দাঙ্গা' এরপর 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' এই নামে চালু রইল। শেখ্ আবদুল্লা ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজার বিরুদ্ধে "ছোড়ো কাশ্মীর" এই আন্দোলন শুরু করল এবং মনে হয় তা কার্যকরী হওয়ার জন্যই গান্ধীজী এধরণের উপদেশ দিতে লাগলেন যে, কাশ্মীরের মহারাজা তাঁর রাজ্য শেখ আবদুল্লার হাতে কিংবা কাশ্মীরের মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে কাশীতে গিয়ে বসবাস করুক। এর পরিনতি কি হত? কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অন্তর্ভুক্ত হত কি? 'স্যেকুলার' শেখের তো ইচ্ছা তা ছিল না। গান্ধীজীরও এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রবৃত্তির প্রতি কি ভাবে সমর্থন ছিল তা তখনকার ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

১৯৪৭ এর ১লা আগষ্ট গান্ধীজী কাশ্মীর গিয়েছিলেন। Times পত্রিকার সংবাদদাতা পরে লিখেছেন গান্ধীজীর কাশ্মীর গমন এবং সেই সঙ্গে তাঁর বিবৃতি কাশ্মীরের রাজনীতিতে এক প্রলয় সৃষ্টি করেছে। "কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করা কাশ্মীরের মানুষের হাতে থাকবে"—তাঁর এই বিধানে কাশ্মীরের অবস্থা উত্তর পশ্চিম সীমাপ্রান্তের মত হল। গান্ধীজী নিজের মত প্রকাশ করলেন "কাশ্মীর অমুক রাজ্যের (হিন্দুস্থান বা পাকিস্তান) সাথে সংযুক্ত হোক এই চাপ আনা আমার কাশ্মীর যাত্রার উদ্দেশ্য নয়! আমরা কাশ্মীরের জনতাকে অবহেলা করছি না—এ দেখিয়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। সংযুক্তিকরণ সমস্যার সমাধান প্রজাই করবে কারণ প্রজাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ"।

১৯৪৭ এর ৬ই আগষ্ট গান্ধীজী বাহ্‌তে ভাষণ দিলেন। তাতে দুই দেশ অর্থাৎ হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান, কাশ্মীরের মহারাজা ও কাশ্মীরের জনতা এরাই কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান করবে বলে আশা ব্যক্ত করলেন। তিনি আরও বললেন যদি এরা সবাই মিলে সর্ব-সম্মতিক্রমে এক সিদ্ধান্ত নেয় তবে কষ্ট লাঘব হবে। কাশ্মীর একটি বড় করদ রাজ্য এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে (Strategically) এর গুরুত্ব অনেক। কাশ্মীরের জনতার বেশীরভাগ মুসলমান কিন্তু তাদের মধ্যে আঞ্চলিক দেশভক্তি (Local Patriotism) আছে। এ ধরনের মতও গান্ধীজী প্রকাশ করলেন! (Kashmir ! A Study in India—Pakistan Relations—Sisir Gupta, Page-97)

কাশ্মীরের মুসলমানরা "মুসলমান" বলেই তারা অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র—এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তাদের এই স্বতন্ত্রতাকেই উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাদের আঞ্চলিক দেশভক্তি মানেই মহারাজার বিরুদ্ধে উত্থান করার চেষ্টাকে সমর্থন করা। কাশ্মীরে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল! ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে শেখ্ আবদুল্লা কাশ্মীরের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে চাইছিল। হিন্দু সংখ্যাধিক্য রাষ্ট্রে সংযুক্ত হওয়া মানেই নিজেদের স্বতন্ত্র সত্বা নষ্ট করা—তার মনের এই সুপ্ত চিন্তা তার আচরণে প্রকাশ পেত। ১৯৪৬ এর মে মাসে "ছোড়ো কাশ্মীর" এই আন্দোলনের জন্য শেখ্ আবদুল্লার ৯ বৎসরের কারাদণ্ড হল! কিন্তু সওয়া বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৭ এর ২৯শে সেপ্টেম্বর তাকে মুক্ত করা হল! পণ্ডিত নেহেরুর মধ্যস্থতায় এই মুক্তি ঘটেছে বলে মিঃ কার্বেল মত প্রকাশ করেছেন। (Page 70) বন্দীগৃহ থেকে বেরিয়েই শেখ্ আবদুল্লা প্রচার করতে লাগলো "কাশ্মীরের নাগরিকদের হাতে অধিকার দিতে হবে"!

কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং-এর অবস্থা ছিল বিচিত্র! রাজা হিন্দু, কিন্তু বেশীরভাগ প্রজাই মুসলমান, একসময়ে এ ছিল হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য ভাগ! অথচ প্রজারা ধর্মান্তরীত হয়ে মুসলমান হয়ে যাওয়ায় আজ হিন্দুস্থানের সাথে সংযুক্ত হওয়ার বিরোধী। তথাকথিত স্বরাজ এবং দেশ বিভাগের সাথে সাথে করদ রাজ্যের সংযুক্তিকরণের বিষয়ও জড়িত ছিল! পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হওয়া মানেই জম্মু, লাদাক প্রভৃতি অঞ্চলের হিন্দুদের সংহারকে আমন্ত্রণ জানানো এবং সাথে সাথে নিজেরও গদিচ্যুত হওয়া, আবার হিন্দুস্থানের সাথে সংযুক্ত হওয়া মানেই রাজার বিরুদ্ধে মুসলিম নাগরিকদের বিদ্রোহ করবার আমন্ত্রণ দেওয়া। ক্ষমতা হস্তান্তরের দুই মাস আগে মেজর জেনারেল জনক সিং কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। তিনি মহারাজের হয়ে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তানের সাথে স্থিতাবস্থা চুক্তি (Stand still agreement) করলেন। সেই চুক্তি অনুযায়ী দুই দেশেরই কাশ্মীরের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য চালু রাখার কথা। কিন্তু পাকিস্তান বাধা আনলো! গাড়ী যাতায়াতের বিঘ্ন ঘটাতে লাগলো। কাশ্মীরের সাড়ে চারশো মাইল সীমা দিয়ে চরমপন্থী মুসলিম দল আর সৈনিক কাশ্মীরে প্রবেশ করল, লুটপাট, হত্যাকাণ্ড শুরু করে দিল। ১৯৪৭ এর ১৫ই অক্টোবর কাশ্মীরের মহারাজা,

বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন যে পাকিস্তান স্থিতাবস্থাচুক্তি ভঙ্গ করে গুরুদাসপুর ও গিল্‌গিটে আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছে এবং পুঞ্চ-এ আক্রমণ চালু করেছে। পত্রে মহারাজা বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে লিখলেন যে, তিনি যেন পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দেন।

সেই চিঠির উত্তর পাওয়া যায়নি!

১৯৪৭ এর ১৮ই অক্টোবর মহারাজা হিন্দুস্থানের গভর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্টব্যাটেন এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল জিন্নাকে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন। জিন্না চিঠির উত্তর পাঠালেন। তাতে তিনি পূর্ব পাঞ্জাবের অশান্ত বাতাবরণের জন্য গাড়ী চলাচলের বিঘ্ন হচ্ছে বলে জানালেন! মহারাজার চিঠির ভাষা কঠোর হয়েছে বলেও জিন্না অভিযোগ করলেন। বা-রে! আক্রমণ করার অধিকার পাকিস্তানের আছে—আর সেই আক্রমণের বেদনা প্রকাশ করার অধিকার কাশ্মীরের মহারাজার থাকবে না!

হম্ আহ্ ভী ভরতে হ্যাঁয়, তো হোতে হ্যাঁয় বদনাম্
ইয়ে কতল ভী করতে হ্যাঁয়, তো চর্চা নহীঁ হোতী।

তারপর তিন চারদিনের মধ্যেই পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করল। পাকিস্তানের যেসব সেনাধিকারী ছুটিতে ছিল তারা সব আফ্রিদি, বঝিরী মশহদ, পাঠান-ইত্যাদি নামকরা চরমপন্থী মুসলিম দলের নেতৃত্ব করতে লাগলো! "গাড়ী" ও "ডোমেল" বিধ্বংস করে তারা মুজাফরাবাদে পৌছালো! সেখানে লেঃ কঃ নারায়ণ সিং এর বাহিনীর বিশ্বাসঘাতক মুসলমান সৈনিকরা তাদের সাথে যোগ দিল। তারপর তারা "উরী" হস্তগত করল। ব্রিগেডিয়ার রাজেন্দ্র সিং উরীতে শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর সাথে মাত্র ১৫০ জন সৈন্য ছিল। সেই কয়েকজন সৈন্য নিয়ে দুদিন ধরে তিনি প্রচণ্ড যুদ্ধ করে শত্রুদের মোকাবিলা করলেন। শেষে তাঁর সমস্ত সৈনিক এবং তিনি নিজে মারা গেলে 'উরী' শত্রুদের হাতে গেল। শত্রুরা ২৪শে অক্টোবর মাহুরা বিদ্যুৎকেন্দ্র হস্তগত করল। এখান থেকে শ্রীনগরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হত। সমস্ত শ্রীনগর অন্ধকার হয়ে গেল! ২৬শে অক্টোবর ছিল ঈদের দিন। ঐদিন শ্রীনগরের মসজিদে ঈদ উদ্‌যাপিত হবে বলে তারা ঘোষণা করল!

হিন্দুস্থান শাসনের কাছে কাশ্মীরের মহারাজার কাছ থেকে ঐদিন মানে ২৪শে অক্টোবর সাহায্যের জন্য বিশেষ অনুরোধ এলো। পরের দিন মানে ২৫শে অক্টোবর হিন্দুস্থান শাসনের প্রতিরক্ষা দপ্তরের সভা বসল। অধ্যক্ষ ছিলেন মাউন্টব্যাটেন। সাহায্য পাঠানো নিয়ে নানারকম আলোচনা হল। অধিকারীরা শ্রীনগর থেকে দিল্লি এবং দিল্লি থেকে শ্রীনগর দৌড়ঝাঁপ করলেন। আইনগত দিক থেকে কাশ্মীর হিন্দুস্থানে সংযুক্ত হলে তবেই তার সাহায্যে যাওয়া সম্ভব ছিল!

"শেখ্ আবদুল্লাকে অবিলম্বে শাসন গঠন করতে দেওয়ায় আমার ইচ্ছা আছে"— একথা মহারাজা হিন্দুস্থান শাসনকে সংযুক্তকরণের পত্রে লিখে জানালেন। মহারাজার

এই প্রস্তাব স্বতস্ফূর্ত ছিল, নাকি সামরিক সাহায্যের জন্য শর্ত ছিল—একথার, কাগজে পত্রে কোন প্রমান না পাওয়া গেলেও মিঃ কার্বেল এর Danger in Kashmir-এ ৮৫ পৃষ্ঠা অনুযায়ী শর্ত থাকার সম্ভাবনা আছে বলেই সন্দেহ হয়! তাছাড়া শ্রী হরিলাল সাক্সেনা তার "The Iron Curtain in Kashmir" অষ্টম (VIII) পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে লিখে গেছেন যে হিন্দুস্থান শাসন স্থিতাবস্থাচুক্তির স্বীকার তখনই করল, যখন ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা শেখ্ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের রাজা মুক্তি দিলেন!

শেখ্ আবদুল্লাকে শাসন ক্ষমতায় বসতে দাও এই শর্তেই কাশ্মীরকে সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল। একথা প্রমান করার জন্য অন্য কোন তথ্যের প্রয়োজন পড়ে না!

কাশ্মীরের সংযুক্তিকরণ স্বীকার করা হল। সেই অনুযায়ী সেনা পাঠানো স্থির হল! শর্ত কিন্তু এই রইল যে আক্রমণকারীদের তাড়ানোর পর কাশ্মীর কোথায় (হিন্দুস্থানে কি পাকিস্তানে) সংযুক্ত হবে অথবা কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ নীতি কি হবে তা কাশ্মীরের জনগণই নির্দ্ধারণ করবে। শেখ আবদুল্লা নিজের পরিবার বর্গদের সুরক্ষার জন্য, আত্মীয়ের বাড়ী ইন্দোরে রাখলো এবং নিজেও শ্রীনগরে রইল না! (The Iron Curtain In Kashmir Page No.-25)

কাশ্মীরের ভবিষ্যত, জনতাই নিদ্ধারণ করবে এ কথা হিন্দুস্থান মেনে নিয়েছিল। এখানে ইতিহাসের বিস্মরণ হল না কি? সেখানে মুসলমান সংখ্যাগুরু বলেই তাদের এতটা স্বাধীনতা, মুসলিম আক্রমণের ফলে হিন্দুস্থানের ঐ ভাগ অনেক শতক ধরে অন্যের দাসত্বে রইল—এ কি ইতিহাস নয়? আটশো বছর আগে সেখানে হিন্দুরাজ্য ছিল—একথার বিস্মরণ কেন? আক্রমণকারীদের কাশ্মীর থেকে তাড়াবার জন্য আমাদের সৈনিক আত্মত্যাগ করবে, তারপর সেখানকার মুসলমানদের খুশি করার জন্য তাদের বলা হবে তোমরা এবার বিপদমুক্ত হয়েছো এবারে যেখানে খুশী যাও। সেখানকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সেখানকার মুসলমানদের মর্জির উপর ছাড়তে হবে। তাহলে এই দৌড়ঝাঁপ কেন? এই সৈনিকদের বলি দেওয়া হচ্ছে কেন? শ্রী ভি. পি. মেনন হায়দ্রাবাদের ঘটনার সময়ে যে একটা কথা বলেছিলেন, এখানে তা উল্লেখ করলে প্রাসঙ্গিক হবে—It is axiomatic that no nation can afford to be generous at the cost of it's integrity and India had no reason to be afraid of her own shadow. (একথা সতঃসিদ্ধ যে অখণ্ডতা নষ্ট করে উদার হওয়া কোন দেশের পক্ষে সম্ভব নয় আর হিন্দুস্থানকে তো নিজের ছায়া দেখে ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না।)

আমরা কাশ্মীরকে আত্মনির্ধারণের স্বাধীনতা দিয়েছি—এর সমর্থন করতে গিয়ে শ্রী মেনন তাঁর পুর্বোক্ত বইয়ের ৪১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, কাশ্মীর ব্যাপারে আমাদের সম্প্রসারণবাদী আকাঙ্খা ছিল না! চরমপন্থী মুসলিম দলগুলো হস্তক্ষেপ না করলে হিন্দুস্থান হস্তক্ষেপ করতো না! মাউন্টব্যাটেন তো খোলাখুলিভাবে জানালেন হিন্দুস্থান শাসনের পক্ষ থেকে কাশ্মীরের মহারাজকে অধিকারগতভাবে বলা

হয়েছিল যে, যদি তিনি পাকিস্তানের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তাও করতে পারেন!

তার মানে আত্মনির্ধারণের স্বাধীনতা না দিয়ে "কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অংশ"—একথা বলা মানেই হত—সম্প্রসারণবাদী হওয়া—এ হচ্ছে মেননের মত দায়িত্বশীল রাজনীতিজ্ঞের মত! তা হলে তাঁর মতে হিন্দুস্থানের ভূগোল কোথা থেকে শুরু হয়েছে—যা আমাদের ভোলা উচিৎ নয় বলে তিনি মনে করেন? অথবা যা ভুলে গেলে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনে বলে তাঁর আশঙ্কা। চরমপন্থী মুসলিম দলগুলোর কাশ্মীর আক্রমণ মানেই মহম্মদ গজনীর মত দিল্লি আক্রমণের প্রস্তুতি একথা তিনিই লিখেছেন। তার মানেই হচ্ছে, ঐ আক্রমণ কাশ্মীরেই রুখতে হবে—তবেই হিন্দুস্থানের অখণ্ডতা রক্ষা হবে। তাহলে কাশ্মীরের হিন্দুস্থানে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করা—সম্প্রসারণবাদ হয় কি করে? আমার মাথায় তো ঢুকছে না—পাঠক আপনাদের ঢুকছে কিনা দেখুন!

আর হিন্দুস্থান শাসন কিসের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নিল—কাশ্মীর পাকিস্তানে বিলীন হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই? প্রজা মুসলমান বলে তাহলে আমরা দ্বি-রাষ্ট্রবাদ স্বীকার করি না এই মিথ্যাচার কেন?

মেনন পুর্বোক্ত বইয়ের ৪১২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে জিন্না এবং মুসলিম লীগ, দেশবিভাগের আগে, যা কিছুই প্রচার করে থাকুন না কেন দেশ বিভাগ মেনে নেবার সময় কংগ্রেস নেতারা দ্বিরাষ্ট্রবাদ নীতিতে মত দেয়নি। তার মানে দেশ বিভাজন করে, মুসলমানদের জন্য, আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণ করে দেওয়া হল—সেটা একটা সাধারণ ঘটনা মনে করে উড়িয়ে দিতে হবে? অথবা কংগ্রেসের সৃষ্টি থেকেই পাকিস্তান বাদ দিয়ে যেটুকু থাকে—ভূগোলে, হিন্দুস্থান সেটুকুই ছিল বলে ধরতে হবে? এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে শেখ্ আবদুল্লা কিংবা তার ন্যাশনাল কনফারেন্স যদি দ্বিরাষ্ট্রবাদ বিশ্বাস না করে—কিংবা 'স্যেকুলার' হয়ে থাকে তবে স্যেকুলার হিন্দুস্থানে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হতে আপত্তি কেন? কংগ্রেসীদের দ্বিরাষ্ট্রবাদ মানা না মানার এই বন্ধ্যা ধারনার সু-সঙ্গত উত্তর কখনও পাওয়া যায় নি। তারা যখন যা অর্থ করবে —তাই আমাদের মেনে নিতে হবে!

"আমরা দ্বিরাষ্ট্রবাদ স্বীকার করি না"—এ ছিল এককথায় ভণ্ডামী। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র, হিন্দুস্থানের ভূমিতে হিন্দু আর মুসলমান—এই ভিত্তিতে আলাদা আলাদা রাষ্ট্র নির্মাণ করে আবার "আমরা দ্বিরাষ্ট্রবাদ মানি না" বলে মিথ্যাচার করা যেমন 'বলা' এবং 'করার' মধ্যে অসংগতির প্রবর্ত্তন—ঠিক তেমনি কাশ্মীর মানেই মুসলমান, মুসলমান মানেই শেখ্ আবদুল্লা—এই সমীকরণ সামনে রেখে গান্ধীজী অহিংসার আড়ালে যে খেলা দেখালেন তাও ছিল এক নূতন ভণ্ডামীর প্রবর্তন! হয়তো সেখানে আজ মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ—কিন্তু একসময়ে এই সংখ্যাগরিষ্ঠদের পূর্বপুরুষ হিন্দু-সংস্কৃতি থেকে ভ্রষ্ট হতে বাধ্য হল সেই আটশ' বছরের ইতিহাস ভুলে যাওয়া আর

নির্বিঘ্নে অথবা চাপে পড়ে, পাকিস্তানকে সেই অংশ ছেড়ে দেওয়া—এতে সামগ্রিকভাবে হিন্দুস্থানের সর্বনাশ সূচিত হবে—একথা বল্লভভাই প্যাটেল সহ তখনকার নেতারা চিন্তা করেন নি কি?

১৯৪৭ এর ২৬শে অক্টোবর স্থির করা হল কাশ্মীরে হিন্দুস্থানের সৈন্য বিমানে করে পাঠানো হবে। পরের দিন খুব ভোরে প্রায় ১০০ বিমান প্রস্তুত হল। সকাল দশটার সময় শ্রীনগরের বিমান বন্দরের ওপর চক্কর কাটতে লাগলো এবং বিমান বন্দরের কোনরকম ক্ষতি হয়নি—এব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বিমান নিচে নামলো!

উগ্রপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী বারমুল্লা পর্যন্ত এসে পড়েছিল, শ্রীনগরের আশেপাশেও তারা পৌঁছেছিল। বারমুল্লা থেকে শ্রীনগরের রাস্তা ছিল। এদের সৈন্যবল, অস্ত্রবল কতটা, আমাদের সৈন্যরা তা অনুমান করতে পারে নি! লেঃ কঃ রায় বারমুল্লার দিকে অগ্রসর হলেন। উগ্রপন্থী মুসলিম গোষ্ঠী সংখ্যায় প্রচুর এবং অত্যন্ত আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত দেখে লেঃ কঃ রায় পট্টনে সরে এলেন। সেখানে অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে সংঘর্ষ করে তাঁর সৈন্যরা এবং তিনি মারা গেলেন। ৪ঠা নভেম্বর মুসলমান সৈনিকরা লেঃ কঃ মাজিদ খানের নেতৃত্বে গিল্‌গিটে স্বতন্ত্র রাজ্যের ঘোষণা করল! সম্পত্তি লুটপাট করা এবং হিন্দু মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া হল—প্রচুর হিন্দুদের হত্যা করা হল। গ্রামের মুসলমানরা আক্রমণকারীদের মার্গদর্শন ও সাহায্য করছিল! শ্রী মেনন লিখেছেন—নাদির শাহ'র দিল্লী ধ্বংসের বর্ণনা আমরা পড়েছি—এরা তারই পুনরাবৃত্তি এখানে করেছে। হিন্দুস্থানের সৈন্যরা একত্রিত হয়ে আক্রমণ করে, ৮ই নভেম্বর বারমুল্লা পুনরুদ্ধার করল। ১৪ হাজার লোকবসতির সেই জায়গায় বড়জোর এক হাজার লোক বেঁচেছিল!

কিন্তু এছাড়া মুসলমান আক্রমণের অন্য পদ্ধতিই বা কি? এদের সংখ্যা বাড়লোই বা কি করে? ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হল—এই আর কি?

১১ই নভেম্বর রাজৌরীতে উগ্রপন্থী মুসলমানদের অমানুষিক অত্যাচারের নমুনা দেখা গেল! দশ হাজার হিন্দু হত্যা করা হল। তিন হাজার হিন্দু মহিলা তহশীল অফিসের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড রচনা করে অগ্নিপ্রবেশ (জহর) করল! (The Iron Curtain In Kashmir—লেখক হরিলাল সাক্‌সেনা) হিন্দুস্থানের সৈন্য যখন রাজৌরী পৌঁছালো তখন তারা দেখলো শুধু মৃতদেহের স্তুপ!

আমাদের সৈন্য ১১ই নভেম্বর "উরী" মুক্ত করল। ভয়ানক, ক্রুর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে আমাদের সৈন্যরা প্রচণ্ড মানসিক ধৈর্য্য দেখিয়েছে। এবং তারা একের পর এক শত্রু কবলিত ভূখণ্ড ফিরিয়ে নিয়েছে।

২৫শে নভেম্বর মীরপুরে ১৫ হাজার হিন্দু হত্যা করা হল। নিজেদেরই লোক, নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে গেলে মূলধর্ম ও সংস্কৃতির ওপর কি ভাবে প্রহার হানে—এ হচ্ছে তার প্রমান!

ধর্মান্তর এখানেও রাষ্ট্রান্তরে পরিণত হয়েছে!

এদিকে দিল্লী ও করাচী কিংবা লাহোরের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ চলছিল! কাশ্মীর বিষয়ে সক্রিয় সিদ্ধান্ত নেবার প্রায় এক সপ্তাহ পর অর্থাৎ ২-১১-৪৭ তাঃ পণ্ডিত নেহেরু বেতার ভাষণে বললেন—"কাশ্মীর ব্যাপারে প্রত্যেক পদক্ষেপ নেবার আগে সবরকম পরিণামের কথাই আমরা চিন্তা করেছি। চুপ করে থাকা মানেই হত্যা লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, বলাৎকার ও সংহার—এধরণের অত্যাচারের সামনে আত্মসমর্পণ করা, আর তা হত কাশ্মীরের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা। এ লড়াই—কাশ্মীর আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই, এতে রয়েছে কাশ্মীরের জনতার লোকপ্রিয় নেতৃত্ব। কাজেই সেখানে শান্তি স্থাপিত হলে U. N. O. র মতন কাউকে মধ্যস্থ রেখে জনমত নিয়ে সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করা হবে"। "এখানে লোকপ্রিয় নেতৃত্ব"—মানেই শেখ্ আবদুল্লার নেতৃত্ব বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে!

লাহোর বেতারে লিয়াকৎ আলীর প্রতিক্রিয়া প্রচার করা হল। তিনি ১৮৪৬ খৃঃ অমৃতসরে গুলাব সিং এবং ইংরেজের মধ্যে যে চুক্তি হয়েছিল তাকে 'কুখ্যাত'—আখ্যা দিলেন। তিনি আরও বললেন—হিন্দুস্থানের পক্ষে কাশ্মীরের অধিকার দাবী করা, শুধু অনুচিত নয়—সম্পূর্ণ অনৈতিকও! কাশ্মীরের বিদ্রোহ—কাশ্মীরের জনগণের বিদ্রোহ। কিন্তু কাশ্মীরের জনসাধারণের বিষয়ে বাইরের লোকের সহানুভূতি রয়েছে, এই কারণেই আক্রমণ এবং তা বাইরের থেকে হচ্ছে—হিন্দুস্থান শাসন এইরকম অভিমত প্রচার করছে! মিথ্যা ইতিহাস লেখা হয়েছে। হিন্দুস্থানের আকুল আকাঙ্খা কাশ্মীরকে বাঁচাবার জন্য নয়। কাশ্মীরের ধ্বংসপ্রায় জুলুমী রাজসত্বাকে বাঁচানোর জন্য। কাশ্মীরের ভীতু মহারাজার, হিন্দুস্থানের সাথে বিলিনীকরণের চুক্তি, আসলে কাশ্মীরী জনতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। হিন্দুস্থান কাশ্মীরকে আক্রমণাত্মক সামরিক সাহায্য দিয়েছে!

যদি কাশ্মীর পাকিস্তানে বিলীন হত তাহলে সেখানকার মহারাজার এবং হিন্দুদের পাকিস্তান কি দশা করত—তা লিয়াকৎ আলির এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

১৯৪৭ এর ২১শে নভেম্বর, নেহেরু আবার লোকসভায় এ বিষয়ে ভাষণ (বিবৃতি) দিলেন। তিনি তার ভাষণে এই চার সপ্তাহের ঘটনার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করলেন এবং কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত করার সুযোগ পাবে বলে ঘোষণা করলেন।

২৬শে নভেম্বর, কাশ্মীর বিষয়ে দু'দেশের মধ্যে আলোচনা হল, এবং তাতে বিভাজনের সময়ে যে সব সমস্যার উদ্ভব হয়েছে—সেই প্রশ্নও এলো। ২৭শে নভেম্বর পাকিস্তানকে ৫৫ কোটি টাকা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—এই প্রতিশ্রুতি পাবার সাথে সাথেই পাকিস্তান কাশ্মীর বিষয়ে আরও কঠোর নীতি অবলম্বন করতে লাগলো! কিন্তু টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এই ধারনার (Understanding) উপর যে এই টাকা দেওয়া সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপর নির্ভর করবে।

হিন্দুস্থান নিজেদের কর্তব্য নির্ধারিত করল, পাকিস্তানের "দাদাগীরি" মেনে নেওয়া হবে না বলে নেতারা সিদ্ধান্ত নিলেন। পাকিস্তানকে, উগ্রপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীগুলোকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা শুরু হল।

এই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাশ্মীর সহ সমস্ত প্রশ্নের সমাধান হওয়া না পর্যন্ত এই ৫৫ কোটি টাকা আটকে রাখার নীতি হিন্দুস্থানকে গান্ধীজীর অনশনের জন্য, পরিবর্তন করতে বাধ্য করল!

সদ্‌ভাবনার বা সহযোগের যতই ঢাক পেটানো হোক না কেন, সদ্‌ভাবনার বা সহযোগের কিন্তু কোনরকম যোগ্য সহযোগ পাওয়া গেল না। অর্থাৎ ৫৫ কোটি টাকা দেবার পরেও কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য সহযোগিতা পাওয়া গেল না। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর U. N. O. র সুরক্ষা মণ্ডলে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ঝাপরুল্লা খান গান্ধীজীকে সশ্রদ্ধ ভাষায় শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পন করেছে সত্য, কিন্তু সম্বন্ধীয় নীতির সাথে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। কারণ অধিবেশনের পরবর্তী সত্রে পাকিস্তান নিজেদের আগের দাবীই পুনরায় রাখলো!

সর্দ্দার প্যাটেলের আশঙ্কা পাকিস্তানের দুরভিসন্ধি কার্যে রূপান্তরিত হল, গান্ধীজীর একগুঁয়েমিতে সর্দ্দার প্যাটেল দুঃখিত হয়েছিলেন—তা তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা কিংবা অপ্রতিষ্ঠার জন্য নয়। তিনি তাঁর বিবৃতিতেই বলেছেন—"আর্থিক রফা পাকিস্তানের কাছে অত্যন্ত আকর্ষক মনে হল, কারণ তা হবে পাকিস্তানের পুঁজি। তাই নিজেদের আর্থিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্য পাকিস্তান এই প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল এবং পরে হিন্দুস্থানে সদ্‌ভাবনার যোগ্য উত্তর দিতে অস্বীকার করল!...............তাই আমাদের প্রতিরক্ষার উপর আঘাত করা হবে কিংবা আমাদের খ্যাতি নষ্ট করা হবে—এইরকম কোন বিষয় এই টাকা দেওয়া নেওয়ার ব্যবহারে ঝুলিয়ে রাখা আমাদের পক্ষে যোগ্য হবে না! যেরকম শত্রুতার সম্বন্ধ আছে তা যেন আর তীব্র না হয়—সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে! আমি ১৯৪৭ এর ১২ই ডিসেম্বর আমার বক্তব্যেই বলেছি যে সদ্‌ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা যা করেছি, তার প্রতিদান তো পাইনি উপরন্তু আমাদের সদ্‌ভাবনাকেই ধাক্কা লাগানো হচ্ছে। বর্তমানে পাকিস্তান আমাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংঘর্ষ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংঘর্ষ আরও তীব্র হবে বোঝা যাচ্ছে। যদি পাকিস্তান এই সংঘর্ষে জয়ী হয় তবে সমঝোতার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে হিন্দুস্থানের উপর তাদের আক্রমণের ইচ্ছা আরও তীব্র হবে।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গান্ধীজীর গোঁয়ার্তুমীর কাছে হার মানতেই হল। সর্দ্দার প্যাটেলের মুখ দিয়ে যা বেরোচ্ছিল তা হল দেশের গৌরব বা আত্মসম্মান। কিন্তু হিন্দুস্থানের সেই আত্মসম্মানকে গান্ধীজীর একগুঁয়েমির সামনে বলি দিতে বাধ্য করা হল। বল্লভ ভাই মুখ বুঝে তা সহ্য করলেন। ১৯৪৮ এর ২৬শে জানুয়ারী মুম্বই এর এক সভায় বললেন, "সততা এবং দানের উদ্দেশ্যে আমরা এই ৫৫ কোটি টাকা দিয়েছি,

একথা পাকিস্তানের অর্থসচিব ও লণ্ডনের অর্থ বিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেছেন! কিন্তু আসলে এই দান (৫৫ কোটি) করতে আমরা রাজী হয়েছি—গান্ধীজীকে অনশন ত্যাগ করানোর জন্য!"

এই দানের পরও পাকিস্তানের আক্রমণ থামলো কি? হিন্দুদের সংহার পর্ব শেষ হল কি? নাকি উদ্বাস্তু আসা বন্ধ হল? এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা হিন্দুস্থান শাসনের বেতার ও সংবাদ প্রচার মন্ত্রালয় (Information And Broad casting Ministry) এর ১৯৪৯-এ প্রকাশিত কাশ্মীরের প্রতিরক্ষা (Defending Kashmir) এই প্রতিবৃত্ত পড়লে দেখতে পাবো। সাধারণভাবে চোখ বোলালেও অতিশয় ভয়ানক ঘটনা নজরে পড়বে।

কাশ্মীরের উত্তরাংশে বাইরের থেকে আক্রমণ করা হল। আবার পশ্চিম জম্মুতে স্থানীয় লোকেরাই আক্রমণকারীদের সাহায্য করল। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্রের যোগান বাইরের থেকেই হত। (Defending Kashmir Page -37), অত্যাচারীত এক হাজারেরও বেশী হিন্দু উদ্বাস্তু (মূল রিপোর্টে Non-Muslim লেখা রয়েছে), অসহায় অবস্থায় আমাদের সৈন্যের আশ্রয়ে ছিল। আবার ঐ দিকে সীমারক্ষায় নিযুক্ত রাজ্যসেনাদল, চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীর বেষ্টনে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাদের সাহায্য পৌঁছানো প্রাথমিক কাজ হয়ে পড়ল। শুধুমাত্র পূঞ্চেই ৪০০০০ হাজার উদ্বাস্তু এসে জুটলো। (পৃষ্ঠা ৩৯)

১৯৪৮ এর ২০শে জানুয়ারী লেঃ কঃ কারিয়াপ্পা পশ্চিমাঞ্চলে বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। নৌশেরায় ৬ই ফেব্রুয়ারী ভীষণ যুদ্ধ হল। শত্রুরা একের পর এক আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, বারবার আক্রমণ করতে লাগলো। আমাদের সদ্‌ভাবনা আমাদেরই সৈন্যদের উপর বন্দুকের গুলি হয়ে পড়ছিল! তিনবারে মোট পনেরো হাজার শত্রু সৈন্য নৌশেরে যুদ্ধ করেছিল। আমাদের সৈন্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুর ২০০০ সৈন্যকে শেষ করল। কিন্তু তার জন্য আমাদের ২৯ জন সৈন্যকে বলি দিতে হল আর আঘাতগ্রস্থ হল ৯০ জন। (Page 42)

শীত কমতেই আমাদের সৈন্য শত্রু কবলিত অংশ মুক্ত করার জন্য অভিযান শুরু করল। রাজৌরী শত্রুর অধীনে থাকা সত্ত্বেও উদ্বাস্তুরা সেখানে জমা হচ্ছিল। আমাদের সৈন্য সেদিকে এগিয়ে চলল। ১৯৪৮ এর ১২ই এপ্রিল আমাদের সৈন্য সেখানে পৌঁছালে উগ্রপন্থী মুসলিমরা সব পালাল। হিন্দুস্থানী সৈন্যদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও মাত্র ১২০০ থেকে ১৫০০ উদ্বাস্তুদের বাঁচানো সম্ভব হ'ল। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মহিলা, প্রায় তিন চারশো মহিলাকে হত্যা করার জন্য সারিবদ্ধভাবে বেঁধে রাখা হয়েছিল। উৎপীড়নকারীরা পালিয়ে যাওয়ায় তাদের প্রাণ রক্ষা হল!

অন্য উদ্বাস্তুদের কি হয়েছিল? তারা কোথায় গেল? শাসকীয় বিবরণের ৫৭ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে, এমন সংহার সেখানে হয়েছিল যে বারমুল্লার অত্যাচারও তার কাছে নগণ্য বলে মনে হবে! শহরে শ্মশানের স্তব্ধতা ছিল!

পালিয়ে যাওয়ার আগে মুসলিম উৎপীড়নকারীরা হিন্দুদের নির্বিচারে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর শাবল বা গাঁইতি দিয়ে ভেঙ্গে, কিছু পুড়িয়ে, যেখানে সেখানে মৃতদেহ অর্দ্ধপ্রোথিত, প্রোথিত এবং অপ্রোথিত অবস্থায় রেখে গেলো, টুকরো টুকরো করা শরীরের অংশ দর্শনে ও তার পচা গন্ধে সৈন্যরা আরও বেশী করে বুঝতে পারলো যে সেখানে আসলে কি ঘটেছে। যারা জীবন্ত ছিল, তাদেরও শরীরে ছিল অস্ত্রের আঘাত, তারা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এদিকে ওদিকে আশ্রয় খুঁজছিল। দেড়শ বর্গফুট এবং ১৫ ফুট গভীর তিনটে গর্তে মৃতদেহ ভরা ছিল। সেই মৃতদেহগুলো ঢাকার মতো সময় শত্রুরা পায়নি, রং বেরঙ্গের ভাঙ্গা চুড়ির স্তুপ ও মেয়েদের চপ্পল এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। জমিতে ছিল রক্তের চিহ্ন, অর্দ্ধপ্রোথিত শিশুদের হাতও দেখা যাচ্ছিল। যে হাত ছিল আকাশের দিকে তোলা। এইভাবে রাজৌরীতে দ্বিতীয় দফায় অত্যাচার করা হলো!

১৯৪৭ এর ৫ই নভেম্বর গান্ধীজী অহিংস যুদ্ধের এক স্বপ্নচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এখানে তা মনে পড়ে। একজন সাংবাদিক গান্ধীজীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, "কাশ্মীরের আক্রমণের মোকাবিলা অহিংস পদ্ধতিতে কিভাবে করা হবে?" গান্ধীজী জানালেন— "যাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে তাদের রক্ষা করার জন্য সামরিক সাহায্য দেওয়া হবে না! নিজেদের রাজ্য, অহিংসক সাহায্য পাঠাবে এবং তাও প্রচুর পরিমাণে। এধরণের সাহায্য পাওয়া যাক কিংবা না যাক, আক্রান্তরা আক্রমণকারীর আঘাতের প্রতিরোধ করবে না, (মানে শুধু মার খেতে থাকবে) আক্রান্তরা নিজের নিজের নির্ধারিত জায়গায় (Post of duty) ক্রোধ-রহিত ও দ্বেষরহিত অহিংস অন্তঃকরণে আক্রমণকারীর অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জন করবে। অস্ত্র ব্যবহার করবে না। হাত দিয়েও প্রতিকার করবে না! এই ধরণের অহিংস প্রতিকার যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত শোনা যায় নি বা দেখা যায় নি! এমন বীরত্ব উজ্জ্বলতার প্রতীক হিসাবে গণ্য হবে। তাহলে কাশ্মীর হবে পবিত্র ভূমি। সেই পবিত্রতার সুগন্ধ শুধু হিন্দুস্থান কেন, সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।" (My Non Violence by Gandhiji Page-339)

(এই ধরণের ভাবনা গীতার মর্মবাণী নয় বলেই আবহমান হিন্দুসংস্কৃতি জেনে এসেছে।—অনুবাদক)

এই চিত্র যদি কারও সুন্দর মনে হয় তা হোক কিন্তু মানবতার দৃষ্টিতে এর মত ক্রুর চিত্র এবং অপরের মৃত্যুর বিনিময়ে, নিজে মহামানব সাজার হীন ও সুদূর প্রসারী চক্রান্তকারীর নমুনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আর নেই। বারমুল্লাই হোক বা রাজৌরীই হোক সেখানকার প্রতিকার অহিংসই ছিল। আর তাতে কয়েক সহস্র লোককে প্রাণ দিতে হল। সেই অহিংস প্রতিকারের বীভৎস প্রেত আমাদের সৈনিকরা দেখছিল। সেই প্রেতের দূর্গন্ধেই কি এদেশের পবিত্রতা আসার কথা!?

বাস্তবিক এই ৫৫ কোটি টাকা দেওয়াবার চেষ্টা না করলেই অহিংসার মর্যাদা পালন করা হত। কিন্তু তা না করে গান্ধীজী একদিকে অহিংস যুদ্ধের অলীক চিত্র বর্ণনা করতে লাগলেন ও অন্যদিকে ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার জন্য অনশন শুরু করলেন।

আক্রমণকারীকে আক্রমণ করার জন্য অধিক উত্তেজনা দেওয়ার এই আচরণ তাঁর অহিংস নীতির সঙ্গে মিলছিল না!

রাজৌরী হাতছাড়া হয়ে যাবার প্রতিশোধ নেবার জন্য আক্রমণকারীরা ১৬ই এপ্রিল ৬ হাজার সৈন্যসহ ঝাংঙ্গর আক্রমণ করল। আমাদের সৈন্য তাদের বিতাড়িত করে ২৩শে মে "টিথ্ওয়াল" ২৭ মে "অরুশা" ২৮শে জুন "পোরকান্টো" এইভাবে এগিয়ে গেলো। ১৪ই আগষ্ট "স্কারডু"তে পাকিস্তান সৈন্য প্রচণ্ড আক্রমণ করল। আমাদের সৈন্য প্রতিকার করল। কিন্তু তাদের সাহায্য পাবার কোন আশা ছিল না—বিজয়েরও না! শত্রুর সামনে তারা হেরে গেল! পাকিস্তানীরা জয়ী হয়ে, প্রধান সৈন্য শিবিরে (হেড কোয়ার্টাসে) বিজয় সন্দেশ পাঠালো। তাতে তারা কি লিখল! "সমস্ত শিখদের গুলি করা হয়েছে। সমস্ত মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে।"। (All Sikhs shot. All women raped : Defending Kashmir Page-72)

কেউ বলাৎকার করলে আমরা নীচ মনে করি। যে বলাৎকার করে সেও লজ্জায় প্রকাশ করে না! কিন্তু কাশ্মীর, মানে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে "ধর্মযুদ্ধে" লিপ্ত মুসলমানরা হিন্দু মহিলাদের জোর করে সম্ভোগ করাকে "ধর্মীয় কাজ" মনে করে—এতই গৌরবান্বিত হল যে যুদ্ধে কিরকম বীরত্ব দেখানো হল—যুদ্ধ জয় করে কি কি লুটপাট করা হল—এসব খবরের সাথে ঐ "ধর্ম্মীয় কাজ" এর খবরও তারা পাঠালো!

কোরানের উপর গবেষণা এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এধরণের অপকর্মকে মুসলমানরা ধর্ম্মীয় কাজ বলে মনে করে—একথা বললে হয়তো সাধারণ মানুষ চম্‌কে উঠবে। এ বিষয়ে শঙ্কা নিরসনের যার ইচ্ছা আছে তিনি কোরানের চতুর্থ ভাগ (সুরা) দেখতে পারেন।

বৈষয়িক সম্বন্ধ কার সাথে বৈধ এবং কার সাথে অবৈধ এই তত্ত্ব বলতে গিয়ে "আন্‌নিসা (আন্নিছা) মহিলা কিংবা মহিলা বিষয়ক অংশে এক যুদ্ধ পরবর্তী নীতি তত্ত্বে বলা হয়েছে, আয়াত (শ্লোক) ২৪ এর বিষয় এইরকম।

"আউর বিবাহিত স্ত্রীয়াঁ ভী তুমপর হারাম হ্যায়
জো কিসিসে নিকাহ মে হো সিবায় উনকে জো
(লোঁণ্ডিকে রূপমে) তুম্‌হারে কব্জে মে হোঁ।"

আবুসলিম মোহম্মদ আবদুল হোই এর ভাষান্তর করেছে, রামপুর উত্তরপ্রদেশের মক্তবা অলহস্‌না তা প্রকাশ করেছে, উপরোক্ত উদ্ধৃতি বইয়ের ২৫২ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছে!

উপরোক্ত পুস্তকের ১২৪৩ পৃষ্ঠায় 'লোঁণ্ডি' শব্দের অর্থ এইরকম—"লোঁণ্ডিসে অভিপ্রেত ইয়ে স্ত্রীয়া হ্যায় যো ইসলামী যুদ্ধ মে পকড়কর আঁয়ে আউর রাজকী ওঁর সে লোগোঁ মে বাঁট দী জায়েঁ।" অর্থাৎ লোণ্ডি বলতে ঐ সব মহিলাদের বোঝায় যাদের

ইসলামী যুদ্ধে ধরে আনা হয়েছে এবং রাজ্যের পক্ষ থেকে বিলি করে দেওয়া হয়েছে। পরে আরও বলা হয়েছে যে—"যুদ্ধ মে জো স্ত্রীয়াঁ কৈদ হোকর আয়েংগী উনকে বারে মে ইসলামী কানুন ইয়ে হ্যায় কি, পহ্‌লে উন্‌হে রাজ্যকে হওয়ালে কর দিয়া জায়েগা। রাজ্য কে ইয়ে অধিকার প্রাপ্ত হ্যায় কি উন্‌হে সৈনিকোঁ মে বাঁট দে। ইস্ প্রকার জো স্ত্রী জিস্ ব্যক্তি কে হিস্যে মে আয়েগী ও উসসে সম্ভোগ কর সক্তা হ্যায়....।" অর্থাৎ যুদ্ধে যে সব মহিলাদের ধরে আনা হয়, তাদের সম্বন্ধে ইসলামী কানুন এই যে, প্রথমে তাদের রাজ্যের হাতে সঁপে দিতে হবে। রাজ্যের এই অধিকার আছে—এদের সৈনিকদের মধ্যে বিলি করে দেবার। এইভাবে যে মহিলা যার ভাগে বা ভাগ্যে আসবে সে তার সাথে সম্ভোগ করতে পারবে!

মেয়েদের তুচ্ছ মনে করে এইভাবে ব্যবহার করার প্রথা এককালে ছিল। কিন্তু তা মনুষ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বলে অনুসরণীয় নয়!—এ ধরণের কথা কোন মুসলমান স্বীকার করে কি? উপরোক্ত পুস্তকের ১২৪৩ পৃঃ টিপ্পনী এইরকম—"লড়াই মে কৈদ হোকর আনেবালী স্ত্রীয়াঁ রাজ্যকে লিয়ে এক সমস্যা হোতী হ্যায় জিসে হর সমঝদার ব্যক্তি ভলীভান্তি সমঝসক্‌তা হ্যায়। ইসলামনে ইস্ সমস্যাকা সমাধান বিলকুল স্বাভাবিক রুপমে কিয়া হ্যায়।" অর্থাৎ "যুদ্ধে বন্দী করে আনা মহিলা দেশের পক্ষে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়—একথা সমস্ত বিচারশীল মানুষের ভালোভাবে জানা আছে। ইসলাম এই সমস্যার সমাধান বিলকুল স্বাভাবিকভাবেই করেছে"।

উপরোক্ত পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ ১৯৭০ এর জানুয়ারী মাসে প্রকাশ করা হয়েছে!

বিংশ শতাব্দীর এই কয়েক বছর আগে এই "ধর্মযুদ্ধের"—"সমস্ত মহিলাদের ধর্ষণ করা হয়েছে" (All women are raped) বলে যে বিজয় সন্দেশ পাঠানো হয়েছিল তা পড়ে মনে হয় যে ইসলাম ধর্মমত্বে তা সত্যিই "বিলকুল স্বাভাবিক"।

যাইহোক শত্রু কি করবে, এর চেয়ে নিজেরা কি করবো এই প্রশ্নই তখন ছিল বড়। যুদ্ধে মৃত সৈনিক, অপহৃতা এবং ধর্ষিতা মহিলা এবং যে সমস্ত নাগরিকদের হত্যা করা হল—তারা সবছিল ঐ—

"৫৫ কোটির বলি।"

কারণ ঐ সময় ঐ ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানকে দিয়ে পাকিস্তানের আর্থিক ও সাথে সাথে অস্ত্রবল না বাড়ালে হয়তো পাকিস্তান হিন্দুস্থানের উপর এত জোরদার আক্রমণ করতে পারতো না আর তা হলে হিন্দুস্থানের নাগরিকদের এই অত্যাচার সহ্য করতে হত না!

শুধু মাত্র ৫৫ কোটি দিয়ে যুদ্ধ জয় করা যায় না। অথবা যুদ্ধে এরকম কত ৫৫ কোটি খরচ হয়ে থাকে তা নির্ভর করে তখনকার পরিস্থিতির ওপর। ঐ সময়ের ঐ পরিস্থিতিতে ঐ ৫৫ কোটি টাকা পাকিস্তানের কত উপকারে লাগলো—তা সর্দ্দার

প্যাটেলের বক্তব্য থেকেই বোঝা গেছে। আমাদের কাছে কত কোটি টাকা আছে। ঐ ৫৫ কোটি টাকার জন্য দুঃখ কেন? আমাদের কাছে কত ফকার বিমান আছে। একটা বিমান পাকিস্তান জোর করে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলল তাতে কেন দুঃখ করা হবে, তার জন্য রাগ করেই বা লাভ কি? এ ধরণের বিচার যে রাষ্ট্র করে তাদের রাষ্ট্রমর্যাদা কোনদিন থাকে না! সেই দেশ অন্যের পায়ের তলায় শামুকের মত পিষে মরার যোগ্যই হয়। তাই আমরা বিমান নিয়ে যাবার এবং পোড়াবার বিরুদ্ধে নিজেদের রাগ প্রকাশ করি। কাজেই সেই সময় সম্পূর্ণ দেশ ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

সেপ্টেম্বর ১৩ ও ১৪ তাঃ মারাঠা এবং জাঠ্ রেজিমেন্ট বোট-কুলঘগঞ্জ লক্ষ্যের কাছাকাছি হতেই প্রচণ্ড গুলি বর্ষণের মুখে একটা সম্পূর্ণ কোম্পানী নিঃশেষ হয়ে গেলো। এইভাবে সদ্‌ভাবনা প্রসূত ৫৫ কোটি টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পর প্রায় ১ বৎসর ধরে আমাদের সৈন্যদের কপালে উপহার জুটতে থাকলো—অগ্নিবৃষ্টি।

যুদ্ধ বন্ধ হোক—এ চেষ্টা অনেকদিন ধরেই হচ্ছিল—কিন্তু প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বন্ধ হল ৪৮-র ৩১শে ডিসেম্বর—মধ্যরাত্রি।

স্যেকুলারিজমের ঔরসে—
মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির গর্ভের
জারজ সন্তান—“কাশ্মীর সমস্যা”।

(১) "উপদেশ শুধু অন্যকে দেওয়ার জন্য"

কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতির এক তুলনামূলক উদাহরণ দেখা যাক্।—আজ এই সময় অর্থাৎ ১৯৯০ এর জুলাই মাসের মাঝামাঝি শ্রীলঙ্কায় তামিল এবং সিংহলীদের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গত প্রায় তিন বৎসর ধরে যুদ্ধ চলছে। তামিলরা বিতাড়িত হয়ে হাজারে হাজারে হিন্দুস্থানে আসছে!

হিন্দুস্থান শাসন শ্রীলঙ্কা শাসনকে উপদেশ দিচ্ছে যে শ্রীলঙ্কাতে এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করা হোক যাতে সেখানকার তামিলদের হিন্দুস্থানে আসতে বাধ্য না হতে হয়। (দূরদর্শনের সংবাদ ১৭-৭-৯০)

কাশ্মীর থেকেও লাখো হিন্দু বিতাড়িত হয়ে হিন্দুস্থানের অন্য অঞ্চলে চলে গেছে এবং যাচ্ছে। কাশ্মীরে এমন পরিস্থিতি নির্মাণ করা প্রয়োজন যাতে করে হিন্দু নাগরিকদের নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য না হতে হয় এবং তাদের নিজেদের অঞ্চলেই পুনর্বাসন হয়!

আমাদের হিন্দুস্থান শাসনের ভ্রষ্ট এবং মুসলমান তুষ্টিকরণ নীতির জন্য তাদের পক্ষে এই পরিস্থিতি নির্মাণ করা সম্ভব হবে না! তারা শুধু পারবে অপরকে উপদেশ দিতে কারণ 'উপদেশ শুধু অন্যকে দেবার জন্য, নিজে পালন করার জন্য নয়!'

(২) "ধর্মান্তর মানেই রাষ্ট্রান্তর"

জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে, কাশ্মীর উপত্যকায় ইসলামীকরণ প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। জম্মুর পুঞ্চ, রাজৌরী এবং কাছাকাছি জায়গায় মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সেখানেও ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার রাস্তা প্রশস্ত হয়েছে! বোমাবাজি এবং খুনখারাপীর কার্যকলাপ জম্মু পর্যন্ত পৌঁচেছে। লাদাকে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়া চলছে। (২০-৭-৯০ এর সংবাদ)

কেন্দ্রের ধর্ম নিরপেক্ষ (?) শাসকের ছত্রছায়ায় শেখ্ আবদুল্লা থেকে আরম্ভ করে ফারুখ আবদুল্লা পর্যন্ত ইসলামীকরণের ইন্ধন জুগিয়েছে! আর হিন্দুস্থান শাসনের বর্তমান গৃহমন্ত্রী মুফ্তি মহম্মদ সৈয়দেরও এই ইসমালীকরণের প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট হাত রয়েছে। মুফ্তির মেয়ে ডঃ রুবিয়ার অপহরণের অজুহাতে পাঁচজন মুসলিম উগ্রবাদীকে পাকিস্তানের সীমায় নিয়ে গিয়ে মুক্তি দেওয়া হল। যাতে তারা যেন বিনা প্রতিরোধে পাকিস্তানে প্রবেশ করতে পারে। আর নতুন উদ্যমে কাশ্মীরে হিন্দুদের হত্যা করার ও

তাড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। মুফ্‌তির কন্যা এবং তার পরিবারের অন্যদের হিন্দুস্থানের অন্যত্র ভালোভালো চাকরী দেওয়া হয়েছে, মুফতির পরিবারের সদস্যদের কাশ্মীরে তথাকথিত ভয় আছে। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে এই যে, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হিন্দুদের অর্থহীন তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার জন্যই এরা সর্ব্বত্র চষে বেড়াবার সুযোগ পাচ্ছে। যে সুযোগের (অ) সদ্‌ব্যবহার করবে না সেই মুর্খ!

(৩) "হিন্দু সংহারের শাসকীয় ফাঁদ"

মুফ্‌তি মহম্মদ ঘোষণা করল যে কাশ্মীরে চাকুরীরত হিন্দু, নিজেদের নিজেদের কর্মস্থলে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত যোগদান না করলে তাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। মুফ্‌তির একথা জানা আছে যে, সেখানে হিন্দুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই ঐসব হিন্দুরা নিজেদের চাকরীই শুধু নয়, নিজেদের ঘরবাড়ি সবকিছু ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে মুফ্‌তি তাদের শেষ করার ব্যূহ রচনা করেছে। মুফ্‌তির তৈরী হিন্দু সংহারের এই ফাঁদ হিন্দুরা বুঝতে পেরেছে। হিন্দুরা কাজে যোগদান না করলে স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বদলে অন্য স্থানীয় লোক মানে যাদের ভয় নেই—এরকম লোক—অর্থাৎ মুসলমানদের—যোগ্যতার বিচার না করেই ভর্তি করা হবে—এই ছিল মুফ্‌তির উদ্দেশ্য।

২৫-৬-৯০ এর দিল্লীর 'জনসত্তার' সংবাদ—"জম্মুর কিছু কর্মচারী শ্রীনগর গিয়েছিল, তারা ফিরে আসছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা কর্মচারীও রয়েছেন"।

১৮ই জুন রেসিডেন্সি রোডের প্রাদেশিক মোটর গ্যারেজের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরন হওয়ায় কর্মচারীদের থাকার বন্দোবস্ত তাঁবুতে করে সেখানে আরক্ষীদলের পাহারা বসানো হ'ল!

মঙ্গলবাব (১৯-৬-৯০) এক হোটেলে আয়োজিত কেন্দ্রীয় আরক্ষীদলের এক শিবিরের উপর রকেট আক্রমণ হওয়ায় কর্মচারীদের নিরাপত্তা বলে আর কিছু রইল না! তারা ভয় পেয়ে গেল। তারপর থেকে লম্বা ছুটি নিয়ে চলে যাবার সংখ্যা বাড়তে লাগলো।

কর্মচারীদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন। ৮ই জুলাই ৯০ এর Times of India-র কর্ণাবতী (তের'শ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমক আহমদশাহ গুজরাত আক্রমণ করে গুজরাতের রাজধানী কর্ণাবতী অধিকার করল ও সেখানকার ভদ্রকালী মন্দিরের মূর্তি সরিয়ে মসজিদে পরিণত করল, নাম দিল জাম-এ-মসজিদ। এইভাবে গুজরাটের আরও অসংখ্য মন্দির মসজিদে পরিণত হল আর তার সাথে সাথে কর্ণাবতীর নাম পরিবর্তন করে করল অহমেদাবাদ। হিন্দুস্থানের মুসলিম তোষণকারী নপুংসক রাষ্ট্র কর্তাদের আজও সাহস হচ্ছে না বলপূর্বক পরিবর্তন করা সেই নাম পুনঃ পরিবর্তন করে কর্ণাবতী করা—অনুবাদক) সংস্করণে বেরোল—কেন্দ্রের অধীনে কাশ্মীরে নূতন করে

শূন্য পদ পূরণ করা হবে বলে মুফ্তি মহম্মদ সৈয়দ ৭ই জুলাই শ্রীনগরে ঘোষণা করেছেন। এইসব শূন্য পদগুলো (চাকুরী), ভীত ও বিতাড়িত কাশ্মীরী হিন্দুদের স্থান ত্যাগের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে।

অ-মুসলিম এবং অ-কাশ্মীরী কর্মচারীদের পালিয়ে যাবার দরুন—বীমানিগম, ডাক-তার বিভাগ, ব্যাঙ্ক. এইচ্‌. এম, টি. প্রভৃতি কার্যালয় ক্রমশ অচল হয়ে পড়েছে। স্থানীয় লোকেদের শূন্যপদে ভর্তি করা হবে, গেজেটেড ও অন্য পদে স্থায়ী (Permanant) কর্মচারী নিয়োগ করা হবে, আর এই নিয়োগ এক মাসের মধ্যেই হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মুফ্তি স্যেকুলার হিন্দুস্থানের পয়সায় রাজনীতির ইসলামীকরণ করে দেখালো!

(৪) "কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় উৎসব ঈদ"

ফারুক আবদুল্লা গত বৎসর ঈদ উৎসবের অজুহাতে ২২ জন উগ্রবাদীকে মুক্তি দিল।

১৯৯০ এর জুলাইয়ের শুরুতে মুফ্তি ঈদের দিন আঠেরোজন উগ্রবাদীকে মুক্তি দিল।

এদের মুক্তি ঈদের নিমিত্তে কেন দেওয়া হল? ঈদ কাশ্মীরে রাষ্ট্রীয় উৎসব কবে থেকে হল?—এ প্রশ্ন তাদের কেউ করবে না! শূন্য হওয়া পদে যে কোন জায়গায় যে এদের নিয়োগ করা হবে সেকথা বোঝাই যায়।

(৫) "শাসন আনুগত্য কিনবে"

কাশ্মীরে স্থানীয় মুসলমানদের সাহায্য দেওয়ার শাসকীয় নীতির অনুসরণে শাসন সম্পত্তি বিতরণের ব্যবস্থা চালু করল। এই করে নাকি দেশের প্রতি আনুগত্য কেনা হবে। ২১-৭-৯০ তারিখে কাশ্মীর রাজ্যপালের পরামর্শদাতা বেদ মারওয়া দূরদর্শনে ঘোষণা করলেন যে ৫০ কোটি টাকা বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কারণ পর্য্যটক আসা বন্ধ হওয়ায় স্থানীয় লোকেদের যথেষ্ট লোকসান হচ্ছে। ৫ কোটি টাকা বোনাই কাজ করার কর্মীদের ব্যবসা চালু রাখার জন্য তাদের সংস্থাকে দেওয়া হল।

নিরন্তর ভাঙচোর, বোমাবাজি, এবং গোলাগুলির জন্য লেগে থাকা কারফিউ, কারফিউ এর জন্য কার্যালয়ের কাজ বন্ধ। কারফিউ না থাকলেও কর্মচারীরা ভয়ে পালিয়ে যাওয়ায়, আর তার বদলে নতুন নিয়োগ না হওয়ায়, কার্যালয়ের উপস্থিতি শূন্য প্রায়—এই অবস্থায় শ্রী বেদ মারওয়া কি করে—কার সাহায্য নিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকেই বিতরণ করলেন। কারফিউ এর দিনে, কে বা কোন সংস্থা শাসকীয় কার্যালয়ে এলো? নাকি শ্রী মারওয়া থলি নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে ঐ অর্থ পৌঁছে দিলেন?

সংস্থা স্থাপন করা আর সংস্থার নামে টাকা দেওয়া হল বলে কাগজপত্র তৈরী করা এই ছিল ওই বিতরণের আসল স্বরূপ।

এদিকে রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ কাশ্মীরের আপেল উৎপাদকের সাথে রেলওয়েকে আপেল রস সরবরাহের চুক্তি করল! যে কাশ্মীরে পরের ঘন্টায় যানবাহন চলাচলের রাস্তা সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা শাসন নিজেও দিতে পারছে না! সেক্ষেত্রে এই ধরণের লেনদেন-এর অর্থ স্পষ্ট—মুক্তহস্তে অন্যায়ভাবে শাসকীয় তহবিল থেকে ধন বিতরণ!

"দু চার বছর আপেল পচে পচুক। রেশমের পোকা মরে মরুক—স্বতন্ত্র হতে পারলে সব পূরণ করতে পারবো" —উগ্রবাদীদের এই পরিকল্পনা ফার্নাণ্ডেজ জানতেন না কি? উগ্রবাদীরা হিন্দুস্থান শাসনের কাছ থেকে অর্থ নিতে দেবে—কিন্তু যানবাহন চলাচল সফল হতে দেবে না। অন্ততঃপক্ষে আজকের এই পরিস্থিতিতে!

"কাশ্মীরের বিরুদ্ধে অন্যায়ের চেঁচামেচি অন্যায্য", "সকাল" পত্রিকার এই লেখা শ্রী মিলিন্দ গাড়্‌গিল ২০শে জুলাই এর "প্রজ্বলন্ত" পত্রিকায় পুনর্মূদ্রণ করেছেন। কাশ্মীরের প্রতি ব্যক্তির আয় রাষ্ট্রীয় গড়পরতা আয়ের চেয়ে বেশী—শ্রী গাড়্‌গিল তাঁর লেখায় একথা গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমান করেছেন!

হিন্দুস্থান শাসন সেখানকার মুসলমান মন্ত্রী মণ্ডলের মাধ্যমে নিরন্তর অগনিত টাকা পয়সার বিতরণ করে চলছে। এই চল্লিশ বছরে কেন্দ্র শাসন কাশ্মীরকে সত্তর হাজার কোটীর চেয়েও বেশী টাকা শাসকীয় অনুদান হিসাবে দিয়েছে!

(৬) "অনন্তনাগ মূফতির অমান্য"

জম্মুর শিবিরে অত্যন্ত অব্যবস্থার মধ্যে যে সব বিতাড়িত হিন্দুদের রাখা হয়েছিল—মূফ্‌তি তাদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সবাইকে ইসলামাবাদে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে," হিন্দুরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে যখন জানতে চাইল যে পাকিস্তান নামক "হিন্দু-কোত্‌লখানা"-র রাজধানী ইসলামাবাদে তাদের কেন পাঠানো হবে,—তখন মূফ্‌তি জানালো, সেই ইসলামাবাদ নয়, এই ইসলামাবাদ মানে অনন্তনাগ।

হিন্দুদের মুসলিমীকরণ, মন্দিরের মসজিদিকরণ, সাথে সাথে হিন্দুস্থানেরও মুসলিমিকরণ প্রক্রিয়া অবিরত চলছে। সংস্কৃত, হিন্দি এবং হিন্দুনামের বিরুদ্ধে দ্বেষ থাকা মূফ্‌তীর ধর্মজাত কর্তব্য এবং একমাত্র সেই গুণের জন্যই তাকে, জবরদস্তি করে স্যেকুলার আখ্যা দিয়ে হিন্দুস্থানের ছাতির উপর গৃহমন্ত্রী করে বসানো—স্যেকুলার সুলতানদের জন্মগত অধিকার।

(৭) "অনন্তনাগে মুসলিম দাঙ্গা"

কাশ্মীর সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে মূফ্‌তির চরিত্র প্রকাশ করতেই অনেক শব্দ খরচ হয়ে গেলো। কারণ সেখানকার অন্য কোন মুসলিম নেতার চরিত্র আলাদা করে যাতে লিখতে না হয় সে জন্যই এত বিশদ করে লেখা হল!

১৯৮৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী/মার্চ মাসে অনন্তনাগে মুসলমানরা হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুটপাট করল। বাইশটা মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হল। ঘর থেকে হিন্দু মেয়েদের জোর করে

ধরে নিয়ে গিয়ে তিন চার দিন পরে তাদের ছেড়ে দিল। সৈন্য পাঠাবার পরও কিন্তু হিন্দুরা নিরাপত্তা পর্যাপ্ত মনে করল না, কারণ সেনা সাময়িক,—কিন্তু মুসলমানরা স্থায়ী—এই তাদের বক্তব্য! ঘরবাড়ী ছেড়ে অন্য সুরক্ষিত জায়গায় হিন্দুরা দলে দলে স্থানান্তর করল!

মুফ্‌তি তখন কাশ্মীর কংগ্রেসের অধ্যক্ষ। সে স্থানান্তরিতদের অবস্থা পরিদর্শন করতে গেলে মহিলারা তাকে ঘেরাও করে ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলল—"তোর নির্দেশে তোর চেলারা এবং তোর গুণ্ডারাই আমাদের উপর অত্যাচার করেছে"। মহিলারা তাকে চলে যেতে বাধ্য করল!

রামজন্মভূমিতে অবৈধভাবে যে তালা লাগানো হয়েছিল, ন্যায়ালয় তা খুলে দেওয়ার আদেশ দেওয়ায় তার বিরুদ্ধে এই অত্যাচারী ইসলামী (সাম্প্রদায়িক) দাঙ্গা বাঁধানো হয়েছিল!

(৮) "নরসংহারকারীদের শাস্তি হবে না"

তিরিশজন হিন্দুর হত্যাকারী মুসলিম উগ্রবাদীকে ১৬-৭-৯০ তারিখে দূরদর্শনে দেখানো হল। সাথে সাথে রাজ্যপাল সাক্‌সেনা একথাও ঘোষণা করলেন যে ওদের সাথে সহানুভূতি পূর্বক ব্যবহার করা হবে। নরহত্যা, বাস্তু, রেল, পুল, ইত্যাদি ধ্বংস করার অভিযোগে যে সব উগ্রবাদীদের বন্দী করা হল, তাদের কারও সাজা হবে না। কারণ তারা মুসলমান—এই হচ্ছে তাদের প্রথম যোগ্যতা, দ্বিতীয় যোগ্যতা হচ্ছে তারা 'তথাকথিত' স্যেকুলার—কারণ হিন্দুদের হত্যা করার সময় দৈবক্রমে দু/একজন মুসলমানও তাদের হাতে মারা পড়েছে, সুতরাং তারা স্যেকুলার।

স্যেকুলারিজমের আদর্শ প্রতীক হচ্ছে কাশ্মীর। এ ধরণের বকবকানি অনেকে আজও করেন—একথা ভাবতে অবাক লাগে। "উগ্রবাদীদের" আদর্শ স্যেকুলারবাদী বলে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হলেও আশ্চর্য্য হওয়ার কিছ নেই!

(৯) "তেতাল্লিশ বছর পূর্বের ইতিহাস স্মরণ"

"পাকিস্তান কাশ্মীরের উগ্রবাদীদের অর্থ-অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করছে, কাশ্মীরের ধার্মিক ভাবনা আহ্বান করে পাকিস্তান কাশ্মীরের অর্থাৎ হিন্দুস্থানের স্যেকুলারিজমকে ধাক্কা দিচ্ছে"—এ ধরণের প্রচার আমাদের শাসনের পক্ষ থেকে হতে থাকায় তা শুনতে শুনতে সাধারণ মানুষের কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। রাজীব গান্ধীর শাসনকাল থেকে শুরু করে এখনকার বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর শাসনকাল পর্যন্ত সেই একই 'টেপ' নিরন্তর বাজানো হচ্ছে!

এইসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা আজ থেকে তেতাল্লিশ বছর আগের, অর্থাৎ "কাশ্মীর" যখন থেকে হিন্দুস্থানের নিকট ভয়াবহ 'সমস্যা' হতে শুরু করেছে। সেই শুরুর ইতিহাস দেখুক, তাহলে তাতে নিজেদের ভণ্ডামীর মুখোশ তারা দেখতে পাবে!

২২শে জুলাই ১৯৯০ এর 'বিবেক' পত্রিকায় শ্রীবসন্ত মোহরীর—"কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী কে"? এই লেখায় উপরোক্ত ইতিহাসের সারমর্ম দিয়েছেন, তিনি লিখেছেন, "কংগ্রেসের দুই মহান নেতা মহাত্মা গান্ধী ও জওহরলাল নেহেরু এই দেশকে কি দিয়েছেন? এই প্রশ্ন কেউ করলে আমি তাকে এই উত্তর দেবো যে গান্ধীজী নিত্য শিরঃপীড়া দেওয়ার মত পাকিস্তান নামক প্রতিবেশী দিয়েছেন, আর নেহেরু শীঘ্র মীমাংসা না হবার মতো জম্মু-কাশ্মীরের সমস্যা দিয়ে গেছেন।" যে পাকিস্তান কখনও ছিল না—হিন্দুস্থানকে টুকরো করে তা নির্মান করা হল। এরপর হিন্দুস্থানের কোন অংশ পাকিস্তানকে দিয়ে, পাকিস্তানের জায়গা দখলের আকাঙ্খাকে উৎসাহিত করা উচিত নয় কিংবা ক্ষতিকারক—এ চিন্তা তখনকার রাষ্ট্রকর্তাদের ছিল না!

'অহিংসা প্রভাবশালী অস্ত্র' নিজের এই মত প্রচারের জন্য গান্ধীজী ; চার্চিল, রুজভেল্ট, হিট্‌লার এদের খবর পাঠালেন, তারা যেন যুদ্ধ না করেন কিন্তু সে সব যুদ্ধ কুশলীরা তাঁর কথা শুনলেন না!

কাশ্মীরে অহিংসক যুদ্ধের রূপরেখা কেমন হবে—সাংবাদিকরা তা জানতে চাইলে গান্ধীজী তার এক কাল্পনিক ও আবেগপ্রবণ চিত্র তাদের সামনে রাখেন। সেই চিত্র 'কাশ্মীর' অধ্যায়ের ৯৩ পৃঃ দেওয়া হয়েছে।

তাহলে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরীত করা হল না কেন?—সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও?

গান্ধীজী জানালেন—"আমি অসমর্থ"

'কাশ্মীরে সৈন্য পাঠাবার জন্য গান্ধীজী সম্মতি দিয়েছেন'—একথা পণ্ডিত নেহেরু বলেছেন।

নাথুরাম, ন্যায়ালয়ের কাছে দেওয়া তার বিবৃতির ১০৪ পরিচ্ছেদে সেনা পাঠানোয় গান্ধীজীর সম্মতি দেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন!

পাকিস্তান নির্মান করেও তৃপ্ত না হয়ে, গান্ধীজী অহিংসার সাথে সাথে মুসলিম তুষ্টিকরণের আরও গভীর নীতি গ্রহণ করলেন। কারণ কাশ্মীরের রাজাকে গান্ধীজী সহ্য করতে পারছিলেন না! রাজা ছিলেন হিন্দু—প্রজা ছিল মুসলমান। রাজ্যভার শেখ আবদুল্লাকে হস্তান্তর করে রাজা কাশীতে গিয়ে থাকুক—গান্ধীজীর এই ছিল ইচ্ছা! নাথুরাম তার বিবৃতির ১৪১ পরিচ্ছেদে লিখেছেন, "সত্যি বলতে গেলে এখনই স্যেকুলার রাজ্য-গঠন করার রাস্তা পরিষ্কার হয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী উঠতে বসতে "স্যেকুলারিজমের" বিষয়ে বলে থাকেন। অত্যন্ত দুঃখের সাথে একথা বলতে হচ্ছে যে নেহেরুর উক্তি এবং কার্যাবলী সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যবিহীন—একথা তাঁর নিজেরও খেয়াল থাকে না। কারণ ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তান নির্মান করার কাজে নেহেরু নিজেও অগ্রণী ছিলেন।"

"নিজেদের পাশে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস এবং দ্বেষ এর উপর আধারিত এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করে হিন্দুস্থান কখনও সমৃদ্ধ হতে পারে না—তা নেহেরুর বোঝা উচিত ছিল"।

পাকিস্তান নিজেদের উদ্দেশ্য কখনও লুকোয়নি। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র আর ইসলামী রাষ্ট্রই থাকবে—একথা তারা পাকিস্তান নির্মানের সময়ে ঘোষণা করেছে। তাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে তারা এত একাত্ম ছিল যে প্রত্যক্ষ পাকিস্তানের জন্মদাতা গান্ধীজীর চিতাভস্ম সিন্ধু নদীতে বিসর্জন করার অনুরোধ জানানো হলে তারা স্পষ্ট জবাব দিল—"এক্ কাফের কী রাখ্ (ভস্ম) সে হমে 'পাক' (পবিত্র) নদী না-পাক নহী করনি হ্যায়"!

বাংলাদেশ পাকিস্তানেরই অংশ। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ—এই নামে বিভক্ত হয়ে যাবার পর মুজিবর রহমানের মাথায় এক খেয়াল চাপলো, তিনি বাংলাদেশকে 'স্যেকুলার' দেশ বলে ঘোষণা করলেন। গোঁড়া ইসলামীরা ক্রুদ্ধ হল। তারা শুধু মুজিবকেই নয় তাঁর সম্পূর্ণ পরিবারকে গুলি করে হত্যা করল। আর যারা এই হত্যা করল তাদের কারও সাজা হল না!

হিন্দস্থানের নেতারা 'স্যেকুলারিজম'কে নিয়ে যে বোকামি করল, পাকিস্তান তা কখনও করেনি। ইসলামের প্রসার করা তাদের ধর্মজাত কর্তব্য এবং জন্মগত অধিকার।

হিন্দুস্থানে যে মুসলমানরা রয়ে গেল তারা কি জন্যে রয়ে গেল? ইসলাম বিস্তারের অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করার জন্য। "হাস্‌কে লিয়া পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান"—পাকিস্তান নির্মানের পর পাকস্তানী মুসলমানদের এই ঘোষণা, তাদের নিজেদের জোরে নয়। হিন্দুস্থানে বসবাসকারী মুসলমানদের জোরে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন শহরে এধরণের উদ্‌ঘোষ মুসলমানদের মিছিল থেকে এখনও দেওয়া হয়—অনুবাদক)

যে হজ যাত্রায় পাকিস্তানের মুসলমানরা যায়, সেই হজ যাত্রায় হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও যায়। সেই মক্কা, মদিনা—মুফতি মহম্মদ, ফারুক আবদুল্লা, আবদুল্লা বুখারী প্রভৃতিরা নিজেদের পুণ্যস্থান হিসাবে মানে।

'ধর্ম'—এই ভিত্তিতে, পাকিস্তান যদি কাশ্মীরী উগ্রবাদীদের সাহায্য করে এবং হিন্দুস্থানে হিন্দুদের ও শিখদের মধ্যে ঝগড়া লাগাবার জন্য যদি পাঞ্জাবের উগ্রবাদীদের সাহায্য করে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

(১০) "আগে ধর্ম পরে দেশ"

ধর্ম এবং দেশের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হলে মুসলমানরা ধর্ম-নিষ্ঠাকেই প্রাধান্য দিয়েছে—দেশনিষ্ঠাকে নয়। কাশ্মীর অধ্যায়ে ৮৩, ৮৪ পৃষ্ঠায় শ্রী ভি. পি. মেনন তাঁর "The story of the Integration of the Indian states" পুস্তকের ৩৯৬ পৃষ্ঠায় যে উদাহরণ দিয়েছেন তার উল্লেখ করা হয়েছে। অধীনস্থ এবং বিশ্বস্ত মুসলমান সৈনিকরাই লেঃ কঃ নারায়ণ সিংকে হত্যা করল, আর উগ্রপন্থীদের সাথে যোগ দিল! যা থেকে প্রমানিত হয় মুসলমানরা ধর্ম-নিষ্ঠ, দেশ-নিষ্ঠ নয়।

শ্রী জগ্‌মোহন কাশ্মীরের রাজ্যপাল নিযুক্ত হবার পর উগ্রবাদীদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রিত করার কাজে হাত দিলেন। উগ্রবাদীরা মুসলমান। তারা সৈনিকদের গুলিতে

মরতে লাগলো। তাই "ইসলাম বাঁচাও দল" ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে সংগঠন তৈরী করে চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে পদচ্যুত করতে বাধ্য করল!

এই ষড়যন্ত্রে ফারুক আবদুল্লার সাথে মুফ্তীরও হাত ছিল!

জনতা দলের ৫০ জন সদস্য ১৯৯০ এর শেষে দিকে ইস্তাহার প্রকাশ করল, তাতে তারা লিখল, "মুফ্তি কাশ্মীর পরিস্থিতি জটিল করার জন্য অনেক গণ্ডগোল পাকিয়েছে তাই কাশ্মীরের পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে।" (কেশরী, পুনে ২-৬-৯০)

শ্রী জগ্‌মোহনকে রাজ্যসভার সদস্য নিযুক্ত করার পর তিনি সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, মৌলবী মীরওয়াইজ ফারুককে মারার পর তার মৃতদেহ উগ্রবাদীরা হাসপাতাল থেকে চুরি করে নিয়ে গেল। সেখানে প্রহরার কাজে নিযুক্ত পুলিশ অধিকারী গা ঢাকা দিল!

শ্রী জগ্‌মোহন তাঁর কার্যালয়ের ১৩৭ জন কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করলেন। তারা সবাই উগ্রবাদীদের সবরকমের সাহায্য করছিল। যথা—আক্রমণকারীদের উপর গুলি না চালানো, হিন্দুদের হত্যার জন্য অস্ত্রযোগান দেওয়া, অধিকারীদের গতিবিধি উগ্রবাদীদের জানানো এবং কোন অধিকারীকে হত্যা করার পর উগ্রবাদীদের পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা—এইসব কাজ এই কর্মচারীরা তাদের ইসলাম নিষ্ঠার জন্য করেছে। দেশনিষ্ঠার সাথে তাদের সম্পর্ক শুধু এইটুকু যে, এরা বেতন নিত কেবল হিন্দুস্থান শাসনের কাছ থেকে।

এইসব কর্মচ্যুত কর্মচারীরা আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ে জগ্‌মোহনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। হিন্দুস্থান শাসনের কাছে নয়। ইসলামের ব্যাখ্যায় একে দেশদ্রোহ বলে না! এবং বোধহয় একই কারণে 'স্যেকুলার' মুফ্তীর এবং 'স্যেকুলার' বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর ব্যাখ্যায়ও এ দেশদ্রোহ নয়!

সেই ১৩৭ জনকে পুনর্বহাল করা হবে। মুফ্তী সেই চেষ্টাতেই আছে। জগ্‌মোহনরূপ কাঁটা পথ থেকে সরানো হয়েছে!

কুলাবা জেলার নাম বদল করে রায়গড় করা সহজ—তাতে মুসলমানদের কোন আপত্তি নেই। কিন্তু যে ঔরঙ্গজেব হিন্দু সাম্রাজ্য নির্মূল করার উদ্দেশ্যে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের পুত্র সম্ভাজী মহারাজের চোখ উপড়ে, জিভ টেনে বের করে শরীরের এক এক অঙ্গ টুকরো টুকরো করে অমানুষিকভাবে তাঁকে হত্যা করল, যে ঔরঙ্গজেব 'খড়কীর' নাম বদলী করে ঔরঙ্গাবাদ করল—সেই ঔরঙ্গাবাদকে সম্ভাজীনগর কিংবা আম্বেদকর নগর নাম দেওয়ায় মুসলমানরা বিরোধ করবেই করবে!

দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এদের শ্রদ্ধা বা আনুগত্য স্বভাবতই ঔরঙ্গজেবমুখী।

দেশনিষ্ঠা ধর্মের পথে বাধা জানলে যারা ধর্মনিষ্ঠাকে দেশনিষ্ঠার চেয়ে উঁচু স্থান দেয় তারা "মুসলমান"।

বিনাশেও যাদের বুদ্ধি হয় না তারা "হিন্দু"।

ঠোকর খেয়েও যে শাসন শোধরায় না তা 'সেকুলার' শাসন!

হায়! এই শাসন, কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করবে?

(১১) "স্বরাজ্যের পরিভাষা"

স্বরাজ বা স্বরাষ্ট্র একথা বোঝাতে যখন আমরা শুধুমাত্র ভৌগোলিক অর্থই ব্যবহার করি, তখন আমাদের ধারণা অনেক সীমিত এবং প্রায় অর্থশূন্য হয়ে পড়ে। তাই আক্রমণকারীদের অনুপ্রবেশও সহজ হয়েছে। স্বরাজ বা স্বরাষ্ট্র মানেই ভৌগোলিক স্বয়ং শাসন—এটুকু অর্থই আমরা জেনেছি। হিন্দুর রাজনৈতিক স্বয়ংশাসন মানেই স্বরাজ, একথা আমরা বুঝতে চেষ্টা করিনি। হিন্দুরা যেখানে তাদের নিজেদের জ্ঞান-বিকাশ, কলা-বিকাশ এবং সর্বোপরি ধর্মচর্চা ও তার বিকাশ নির্বিঘ্নে করতে পারবে সেই তাদের স্বরাজ ও ব্যাপক অর্থে স্বরাষ্ট্র।

ভৌগোলিক পরিসীমার স্বয়ংশাসন, তা হিন্দুস্থানের যেই করুক—এই যদি স্বরাজের পরিভাষা হয় তাহলে ঔরঙ্গজেবের সময়েও স্বরাজ ছিল বলতে হবে। কারণ, ঔরঙ্গজেবের জন্ম হিন্দুস্থানেই। কিন্তু আসলে তা হিন্দুর স্বরাজ ছিল না বরং তা ছিল হিন্দুত্বের মৃত্যুকালীন অবস্থা। তাই রাজা সংগ এবং রানাপ্রতাপ, গুরু গোবিন্দ সিং এবং বিরম্বদা, শিবাজী ও বাজীরাও—এঁদের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। অনেকবার এঁদের হার স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু সামলে নিয়ে বারবার তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছেন। কখনও গুর্খারা আবার কখনও শিখরা, কখনও রাজপুতরা আবার কখনও মারাঠারা, আক্রমণকারী বর্বর, অন্ধবিশ্বাসী, শিল্পকলার শত্রু, জ্ঞান বিধ্বংসক বিদেশী ইসলামী সত্বাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হিন্দুস্থানে—হিন্দু-স্বরাষ্ট্র স্থাপন করেছে।

(১২) "স্বদেশ থেকে নির্বাসিত পার্শী"

পার্শীদের ইরানে অর্থাৎ তাদের মাতৃভূমিতে থাকতে কি অসুবিধা ছিল? আরবরা আক্রমণ করেছিল, করুক না। অন্য অনেক নাগরিকতো আরবদের ইচ্ছা মেনে নিয়ে "ছুন্নৎ" করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। "আগিয়ারীর" (পার্শীদের প্রার্থনাস্থান) অগ্নির শিখাকে ধরে রাখার প্রয়োজন কি? আগিয়ারীতে দেবতা থাকলে মসজিদেও তো আছে, আগিয়ারী ভেঙ্গে মসজিদ্ বানালে কি আসে যায়?—

পার্শীরা শুধু বাঁচতেই চায়নি—তারা নিজেদের সংস্কৃতি সহ বাঁচতে চেয়েছিল। যজ্ঞোপবীত অগ্নি, আগিয়ারী ইত্যাদি চিহ্ন এবং শ্রদ্ধাস্থান সহ তাদের জাগতিক অস্তিত্বের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উচ্চতাও বাড়াবার ইচ্ছা ছিল, ইরান তাদের দেশ, কিন্তু তাদের স্বরাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। "স্ব"-এর সংরক্ষণ করা যাবে, "স্ব"-এর বিকাশ করা যাবে যেখানে, সেই স্বরাজ্য বা স্বরাষ্ট্র।

যারা নিজেদের সংস্কৃতি যুক্ত স্ব-ত্ব বাঁচাতে চেয়েছিল, সেই সব পার্শীরা নৌকা ভরে ভরে হিন্দুস্থানে পাড়ি দিল! শুধু ভৌগোলিক-ভূভাগ নয়, স্ব-ত্বকে শ্রেষ্ঠ মানবার

মত পার্‌শীদের একজন ছিলেন স্বর্গীয় ফিরোজ গান্ধীর—অর্থাৎ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর পিতার পূর্বপুরুষ ; যে ভূভাগ তাদের সংরক্ষণ দিতে সক্ষম ছিল না সেই ভূভাগ ছেড়ে দিলেন!

অর্থাৎ ভৌগোলিক রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় শাসন মানেই স্বরাজ নয় বা স্বরাষ্ট্র নয়!

(১৩) "মহম্মদ-বিন-কাশিম ইসলামের সন্দেশবাহক"

ইতি রজীব

এই উক্তি রাজীব গান্ধীর মূর্খতার ও অজ্ঞানতার এক বিস্ময়কর প্রমান। স্বরাজ্য এই ধারণার ব্যাখ্যাই যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় তাহলে অজ্ঞানের অন্ধকারেই আনন্দ।

১৯৮৮-র ৪ঠা জুন রাজীব সিরিয়ায় ছিল, সেই দেশের মানুষের স্তুতি করার লোভ সে সামলাতে পারছিল না, তাই বলল—"সিরিয়া ও হিন্দুস্থানের ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ রয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শুরুতে মহম্মদ-বিন-কাশিম সমুদ্রপথে এসে ইসলামের সন্দেশ হিন্দুস্থানে পৌঁছেছিল। (রাজীব গান্ধীও ইতিহাস আওড়ায়—হায় ভগবান!) কিন্তু রাজীব গান্ধীকে কেউ জানায় নি যে ইসলামের সন্দেশ প্রথম পয়গম্বর মহম্মদ মারা যাবার ১০ বছরের মধ্যেই রাজীবের পিতার পূর্বপুরুষদের মাতৃভূমিতে অর্থাৎ ইরানে পৌঁছেছিল। পুরুষদের "ছুন্নৎ" করে আগিয়ারী মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল, মহিলাদের লুণ্ঠন করে ইসলামের আদেশ মত উপভোগও করা হয়েছিল আর সেই সন্দেশ-এর ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে রাজীবের পিতার পূর্বপুরুষগণ অগ্নিপাত্র সহ হিন্দুস্থানে আসতে বাধ্য হল।

নিজের মাতৃভূমির উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার, শত্রুদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবার ভাবনা বিস্মৃত হলে তবেই বংশধর রাজীবের মত মূর্খ হয়!

রাজীবের ভাষণ যে লিখে দিয়েছিলো, সে ভুলে গিয়েছিলো যে, রাজীব যখন ভাষণ দিচ্ছিল সেই সময় কাশিম যেখানে প্রথম পৌঁছেছিল, হিন্দুস্থানের সেই অংশ অর্থাৎ সিন্ধ তখন হিন্দুস্থানে ছিল না। তার সর্বনাশ চল্লিশ বছর আগেই হয়ে গিয়েছিল!

মহম্মদ-বিন-কাশিম, ইসলামের 'সন্দেশ' মত দাহীর রাজার রাজ্যের অর্থাৎসিন্ধের অনেক মহিলাদের লুণ্ঠন করল। পুরুষদের ছুন্নত করল, মন্দিরকে মসজিদ করল—আর দুজন রাজকন্যাকে উপভোগের জন্য তাদের খলিফার কাছে পাঠালো—এই ছিল সেই অভিনব 'সন্দেশ'!

(১৪) "বিয়ান্ত সিং খালিস্থানের 'সন্দেশ' আনলো"

এইরকম 'সন্দেশ' পাঠাবার এক ছোট্ট ঘটনা কয়েক বছর আগে রাজীব গান্ধীর ঘরেই ঘটেছিল!

কাশ্মীরের উগ্রবাদী নেতা মকবুল বট্-এর ফাঁসি দেওয়া হলে তার প্রতিশোধে রক্ষী বেয়ান্তসিং, পাকিস্তানের পরোক্ষ সাহায্যে খালিস্থানের 'সন্দেশ' প্রাধানমন্ত্রীর ঘরে

১৯৪৮-র ৩১শে অক্টোবর প্রকাশ্য দিবালোক পৌঁছে দিলো, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অর্থাৎ রাজীবের মাকে হত্যা করে!

(১৫) "কাশ্মীরে প্রতিদিন ইসলামের সন্দেশ"

আজ 'ইসলামের সন্দেশ' হিন্দুস্থানের কাশ্মীরে প্রত্যেক দিনই পৌঁছানো হয়। তার জন্য বাইরের থেকে কারোর আসার প্রয়োজন হয় না। 'ভট্ট' বদলে 'বট' হয়েছে 'কোল' বদলে 'ইক্‌বাল' হয়েছে, 'কর' বদলে হয়েছে 'করিম খান'—এরাই এই ধ্বংস-করণের 'অজ্ঞান প্রসারণের', 'ইসলাম বিস্তারের' সন্দেশ প্রচার করছে।

নেতারা ভুলের পর ভুল করতে থাকলেন—হিন্দুদের স্বয়ং শাসন শেষ হল!

দুর্বলের ভগবানও দুর্বল থাকে, সেইরকম ভ্রান্তদের নেতাও থাকে ভ্রান্ত। 'স্বরাজ'—এই শব্দের পরিভাষাই যে বোঝে না!—এমন লোক দেশের প্রধানমন্ত্রী হলে বিশ্বময় নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রদর্শন করে বেড়ায়!

(১৬) "হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া অন্য সমস্যাই নেই"

হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের সংবাদ, সংবাদপত্রে ক্বচিৎই প্রকাশিত হয়। কারণ 'স্যেকুলার' মুখোশ সরে গিয়ে আমাদের ভণ্ডামী যেন প্রকাশ হয়ে না পড়ে; সবাইকে এব্যাপারে দক্ষ থাকতে হয়।

কাশ্মীর সমস্যা—"হিন্দু মুসলমান সমস্যা নয়"—ইসলামের বেতনভুখ মোসাহেবদের এ ধরনের সুরও বাজিয়ে বেড়াতে হবে আবার সামাজিক কর্মকর্তা বলেও নিজেদের প্রদর্শিত করতে হবে।

উগ্রবাদীরা প্রচুর সংখ্যায় পাকিস্তানের পতাকা হাতে নিয়ে, হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে উদ্‌ঘোষ দিতে দিতে বীভৎস তাণ্ডব করে রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। আরক্ষী দলের উপর আক্রমণ করা, তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়া, বাড়িঘর লুটপাট করা, স্কুল, কলেজ, শাসকীয় কার্য্যালয় প্রভৃতি বিস্ফোটক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া—এসব প্রতিদিনের ঘটনা। রাজ্যপাল শ্রী জগ্‌মোহন এ ধরনের দলবদ্ধ আক্রমণকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেন আর ঠেকাতে না পেরে বাধ্য হয়ে গুলি চালালেন।

উগ্রবাদীরা পরের দিন আবার দলবদ্ধভাবে বেরোল। তাতে তারা সেখানকার হিন্দুদের বলপ্রয়োগ করে সাথে যেতে বাধ্য করল। তাদের হাতে ঝাণ্ডা দিল— তাদের উদ্‌ঘোষ দিতে বাধ্য করল। তাদের মধ্যে দু/তিন জন হিন্দু গুলিতে মারাও পড়ল!

বলপ্রয়োগ করেও যারা সহযোগী হয়নি এইরকম দুই হিন্দু পরিবারের 'সাজা' হিসাবে তার পরের মিছিলে তাদের ঘরের মেয়েদের উগ্রবাদীরা টেনে বার করল—তাদের উলঙ্গ করে ছুরি দিয়ে খোঁচা মারতে মারতে মিছিলের সম্মুখে থাকতে বাধ্য করল! দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকা, চিৎকার করে ক্রন্দনরত সেই সম্পূর্ণ উলঙ্গ মহিলাদের নিরুপায়ভাবে শাসকীয় অধিকারীরা শুধু দেখতে থাকলো। দিল্লীর 'নবভারত টাইম্‌স' এর ১৯৯০ এর মার্চ মাসের প্রথম দিকে এই সংবাদ বেরিয়েছিলো!

দিল্লীর কাছে নোয়েডাতে যে সব কাশ্মীরী উদ্বাস্তুরা আশ্রয় নিয়েছিল তাদের সাথে সাক্ষাৎকার 'নবভারত টাইম্স্' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, আর নাগপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'রাষ্ট্রদূত' (হিন্দি) ১৯৯০ এর ৬ই জুনের সংখ্যায় "মহিলাদের শ্লীলতাহানি হয়েছে"—এই শীর্ষকে তা পুনঃপ্রকাশ করেছে, তাতে লিখেছে—"উগ্রবাদী রাত কে সময় আসপাস্ কি বস্তিয়োঁ সে জুলুস নিকালতে হ্যায়। ইস্ জুলুসমে অল্প সংখ্যোকো (হিন্দুওকো) জবরন সামিল কিয়া জাতা হ্যায়। জো লোগ ইন জুলুসমে সামিল নহি হোতে হ্যায় উন্হে ধমকী ভরে পত্র মিলনে লাগতে হ্যায়। উনকী সম্পত্তি কো আগকে হওয়ালে কর দিয়া জাতা হ্যায়। যঁহাতক কি এইসে পরিবার কী মহিলাঁও কো নঙ্গাকর আগলী রাত জুলুস মেঁ সম্মিলিত কিয়া জাতা হ্যায়"।

উগ্রবাদীরা গোলাগুলি চালিয়ে সরে পড়লে আশেপাশে কোথাও তারা আশ্রয় পায়, শ্রী জগ্‌মোহন বাড়ী বাড়ী তল্লাশী করার কাজ শুরু করলেন। তাতে অনেক উগ্রবাদী ধরা পড়ল। তার এই উপায়ের বিরুদ্ধে মুসলমানদের, (মানে হিন্দুস্থানের অন্যত্র বিভাজনপ্রেমী মুসলমানদের) বিলাপ শুরু হল। পুলিশ ও আধা সামরিকবাহিনী ঘরে ঢুকে মহিলাদের উপর অত্যাচার করছে—এ ধরনের অভিযোগও তারা করতে লাগলো।

ঘর যদি হিন্দুদের হয়, সে সব ঘরে রক্ষীরা প্রবেশ করত না। উগ্রবাদীরা তার লাভ উঠালো!

দুজন উগ্রবাদী জোর করে এক হিন্দুর ঘরে ঢুকে পড়ল—"আমাদের আশ্রয় দাও। তোমাদের দুই মেয়ে আছে তাদের বিছানায় আমরা সারারাত থাকবো! আমাদের পিছনে পুলিশ লেগে আছে। এ ঘরে তালাশী নিতে এলে আমরা যে তোমাদের জামাই এই বলে পরিচয় দেবে।" অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে বাড়ীর কর্তাকে, তার স্ত্রীকে ও মেয়েদের তারা বাধ্য করল। সংরক্ষণ বিহীন, অসহায় হতাশ অবস্থায় সেই হিন্দুকে সেই উগ্রবাদীদের রাতভর নিজেদের মেয়েদের বিছানায় 'আশ্রয়' দিতে বাধ্য হল! ইন্দোরের বংবাদপত্রে এই খবর বেরিয়েছিলো!

ইন্দোরের দৈনিক সংবাদপত্র "নয়া দুনিয়া" ৩১শে মে ১৯৯০ এর এক খবরে ছাপালো যে—"জব পুলিশ উগ্রবাদী কী তলাশ মেঁ ছাপে মারতী হ্যায় তো উগ্রবাদী কাশ্মীরী পণ্ডিতোঁ কে ঘরমে ঘুসকর উনকী লড়কীয়োঁ কে সাথ সো জাতে হ্যায় ঔর পরিবার জনকো বন্দুক কী নোকপর ইয়ে কহনে কো বিবশ কর দেতে হ্যায় কি ইয়ে হমারে দামাদ হ্যায়।"

সম্ভবত জুন মাসে জনতা দলের নেত্রী শ্রীমতি মৃনাল গোরের এক ইস্তাহার প্রকাশিত হল। "কাশ্মীর সমস্যা হিন্দু মুসলমান সমস্যা নয়"—বলে মত প্রকাশ করা হল!

হিন্দুস্থানের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এক অংশ হিন্দুস্থান থেকে কেটে আলাদা করা হল! পাকিস্তান নামে ইসলামী রাষ্ট্র করার জন্য। রক্ষণশীল মুসলিম নেতাদের কাছে নতি

স্বীকার করে সেই পরাভবেই তথাকথিত "সর্বধর্ম সমভাব" এই আত্মঘাতী প্রবৃত্তির জন্ম হয়েছিল। কিন্তু "সর্বধর্ম-সমভাবের" মত অপসংস্কৃতিতে সততঃ গড়াগড়ি খেতে খেতে শ্রীমতি মৃনাল গোরে এবং তাঁর সমপন্থীদের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রামানিকতা গ্রহণ করার সুস্থ মনোভাব অকেজো হয়ে গেছে।

হিন্দুস্থানের হিন্দুরাই ইসলাম প্রসারের কাজে মুসলমানের চেয়েও বেশী উপযোগী এই নিশ্চিত ধারণা আরব দেশগুলোর থাকাতেই তারা পেট্রো ডলারের ব্যবহার ঐধরনের হিন্দুদের ক্রয় করার জন্য ব্যবহার করলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই!

(১৭) "একটা ছলনা"

১৯-৭-৯০এ দিল্লীতে মুসলমান সংস্থাগুলো ঘোষণা করল যে কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য অংশ, তাই সেখানে জনমত নেবার এবং তার ভিত্তিতে বিলীনিকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না!

(১৮) "কাশ্মীরের উদ্বাস্তুদের চেয়ে ইরান আপনজন"

কাশ্মীর থেকে বিতাড়িত হিন্দুদের আমরা সবরকম সাহায্য করব, তাদের আশ্রয় দেবো কারণ বিনা অপরাধে এদের ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসবার জন্য সেখানকার মুসলমানরা বাধ্য করেছে—এ ধরনের কোন আহ্বান বা ঘোষণা নিজেদের 'স্যেকুলারপনা' সিদ্ধ করার জন্য কোন মুসলিম সংস্থা করে নি!

ইরানের ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্য হিসাবে হিন্দুস্থান শাসন এক কোটি টাকার ঔষধ ইত্যাদি দিল। আবার মুসলিম সংস্থাগুলো, কয়েকজন মুসলমানের কাছ থেকে এবং বেশীরভাগই হিন্দুদের কাছ থেকে মানবতার নামে আহ্বান করে ছত্রিশ লাখ টাকা জমা করল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তা ইরানের রাজদূতের হাতে তুলে দিচ্ছে—এই দৃশ্য ১৯৯০ এর জুলাই মাসে দূরদর্শনে দেখানো হল!

কাশ্মীর থেকে আসা ভূমিচ্যুতদের কোন মুসলিম সংস্থা সাহায্য করল না কেন? কারণ তারা 'মুসৃক'—মানে মূর্তি-পূজক, কিংবা কাফের—অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী নয়—সেজন্য। কিন্তু ইরান তাদের কাছে পবিত্র দেশ—যার ধর্মীয় নেতা খোমেনী, সল্‌মান রসিদিকে সত্য কথা বলার অপরাধে "ঈশ্বর-নিন্দুক" এই মিথ্যা অভিযোগে হত্যা করার আদেশ জারি করল। হিন্দুস্থানের মুসলমান আর ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় হিন্দুস্থান থেকে ছত্রিশ লাখ টাকা ইরানের সাহায্যে গেলো। ইসলামের পৃষ্ঠপোষক 'স্যেকুলার' (?) প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং এই দান করে নিজেকে ধন্য মনে করল!

(১৯) "শাসন নিস্প্রভ"

"বিপনীর সমস্ত বিজ্ঞাপন—ফলক, সুবজ রংয়ের পটভূমিকায় আর সাদা উর্দ্দু অক্ষরে হওয়া চাই, এতদিনের মধ্যে করতে হবে"—উগ্রবাদীরা আদেশ দেয়।

সমস্ত বিজ্ঞাপন ফলক সেভাবে তৈরী করা হয়। "উর্দ্দু শুধু মুসলমানদের ভাষা নয়"—এ ধরনের বকবকানি করার মত হিন্দু অনেক আছে। কিন্তু হিন্দি কেবল হিন্দুদের ভাষাই নয়—একথা কোন উগ্রবাদী বলে না। "উর্দ্দু" হচ্ছে ইসলামী করণের এক মাধ্যম। "উর্দ্দু" বিভাজনের ভাষা প্রমানিত হয়েছে, কাশ্মীরের মুসলমানদের তা জানা আছে—যেমন জানা আছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের!

দূরদর্শনে কাশ্মীরের কার্যক্রম উর্দ্দুপ্রধান হওয়া চাই। ইসলামের গৌরব দেখাতে হবে—উগ্রবাদীরা আদেশ দেয়!

শাসন তাদের আদেশ মত চলতে থাকে।

দূরদর্শনের অনেক অধিকারীদের উগ্রবাদীরা হত্যা করায় স্থানীয় কেন্দ্র অচল হয়ে আছে।

আকাশবাণীতে বলা হয়—ওয়াঝীরে আজম্।

সময় আধঘন্টা পিছে অর্থাৎ এখানে —১০টা বাজলে সেখানে সাড়ে নয়টা রাখতে হবে—কারণ পাকিস্তানের অনুমোদিত সময় (Standard time) ঐ রকম।

উগ্রবাদীরা আদেশ দেয়

জনগণ মেনে চলে।

শাসকীয় সান্ধ্য আইন শেষ হলে উগ্রবাদীরা আদেশ দেয় আজ তাদের সান্ধ্য আইন। কেউ বাইরে বেরোবে না। গুলি করা হবে!

শাসকীয় কার্যালয়, বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক সব ফাঁকা থাকে।

শাসন আহ্বান করে স্থানীয় লোকেদের নিয়ে সামরিক বাহিনী (Force) তৈরী করা হবে! ভর্ত্তি হও!

উগ্রবাদীরা আদেশ দেয় ভর্ত্তি হলে গুলি করে মারা হবে!

কেউ ভর্ত্তি হয় না!

এই আদেশ মসজিদগুলোর ধ্বনি-ক্ষেপক-যন্ত্র (Loud speaker) দ্বারা দেওয়া হয়। (দিল্লি, মুরাদাবাদ, মীরাট, বুলন্দ শহর, সম্ভল প্রভৃতি জায়গায় মুসলিম দাঙ্গার সময়েও মসজিদগুলোর ধ্বনি-ক্ষেপক-যন্ত্রের দ্বারা মুসলমানদের, হিন্দুদের ওপর কোন দিক দিয়ে আক্রমণ হবে, পুলিশের গাড়ী জ্বালাও এসব আদেশ দেওয়া হয়। তবে তা ওরা যখন দাঙ্গা করে, তখন হয়, কিন্তু কাশ্মীরে তা প্রতিনিয়ত হয়) হিন্দুস্থানের অন্যত্র যাতে এই ইসলামী আদেশ ঘোষণা সুচারুভাবে করতে সুবিধা হয় সেজন্য বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ইমাম বুখারীকে জামা মসজিদের নবিনীকরণ করার অজুহাতে শাসকীয় কোষ থেকে ৫০ লাখ টাকা দিল।

"ভারত" "হিন্দুস্থান" "ইণ্ডিয়া" "হিন্দ"—এ সমস্ত উপপদ বিপনীর বিজ্ঞাপন ফলক থেকে মুছে ফেলতে বলা হয়। না হলে মুছে দেওয়া হয়!

বিদ্যালয়, মন্দির, শাসকীয় কার্যালয়, ব্যাঙ্ক, আর্য-সমাজ, সংস্থাগৃহ ইত্যাদি হিন্দু প্রধান বাস্তু বিস্ফোরক দিয়ে ধ্বংস করা হয়। ঐ বাস্তুর পুন-নির্মান করা সম্ভব হয় না!

উগ্রবাদীরা আদেশ দেয়—বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বোরখা পরতেই হবে! ছাত্রীরা ভুল করে বোরখা না পারলে তাদের মুখে এ্যাসিড ছুঁড়ে মারা হয়! (লণ্ডন টাইম্‌স-এ কালি বলা হয়েছে, কিন্তু কালি নয়, আসলে এ্যাসিড) উগ্রবাদীরা ঘোষণা করে হিন্দু মেয়েরা "কুমকুম" পরুক তাহলে তাদের উপর এ্যাসিড পড়বে না। যেখানে অন্য মেয়েরা বোর্‌খা পরে, যেখানে হিন্দু-পুরুষদের তিলক লাগানো সম্ভব হয় না—সেখানে হিন্দু মেয়েরা কুমকুম লাগাবে কোন সাহসে। এর পেছনের আসল উদ্দেশ্য হিন্দু মেয়েরা বুঝতে পারে।

আগষ্টের ১৪ তারিখে অনেক শাসকীয় বাস্তুর উপর পাকিস্তানী পতাকা লাগানো হয়। মিছিল বের করে "হিন্দুস্থান মূর্দাবাদ" উদ্‌ঘোষ দেওয়া হয়। উপর মহল থেকে পুলিশের কাছে নির্দেশ আসে—'পরিস্থিতি যতই খারাপ হোক না কেন গুলি চালিও না!' এ ধরনের সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে উগ্রবাদীদের সাহায্য করাই পুলিশরা অধিক সহজ কাজ মনে করে, তারা তাই করে।

'মহাভারত-মালিকা' দেখবে না। উগ্রবাদীরা নির্দেশ দেয়! ঐ সময় ঘরে ঘরে গিয়ে টি. ভি. ভেঙ্গে ফেলা হয়। ঠিক ঐ সময়েই যাতে বিদ্যুৎ বন্ধ হয় তার ব্যবস্থা করে!

১৯৯০-এর জানুয়ারীর মাঝামাঝি দেখা পরিস্থিতির বর্ণনা 'লণ্ডন টাইম্‌স' এর ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯০ এর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, তা এখানে উদ্ধৃত করা হল। খুবই সংক্ষিপ্ত, কিন্তু পরিস্থিতি বোঝাবার পক্ষে যথেষ্ট। "কাশ্মীরে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ নেই" একথা যে শাসন বলে সেই শাসন মুসলমানদের সামনে কিভাবে হাঁটু গেড়ে অবনত হল তাও ইংলণ্ডে প্রকাশিত পত্রিকার সংবাদে বোঝা যাবে।

(২০)"কাশ্মীর বিষয়ে 'লণ্ডন টাইমস' এর সংবাদ"—

The Times London 17 Jan 1990 (P-8)

Kashmir in fear as fundamentalists lighten Grip.

From Christopher Thomas, Srinagar.

The freezing, rain-soaked streets of Srinagar told their own story yesterday of what was happening to the Kashmir valley.

Nearly every woman was shrouded in a buraja, video shops sold only pakistani films. Shopkeepers hurriedly erected new Urdu scripted signs above their stores. Cinemas condemned as decadent, were shuttered. Bar keepers, branded as an Islamic, served tea instead.

These are the signs of a new kind of Kashmir—one that is in the unfamiliar grip of Islamic fundamentalism, imposed ruthlessly by

extrimist organizations that now virtually control day to day life in the valley.

The immensely popular cause of Kashmiri nationalism has become inextucably linked with religions fanaticism, a development patently designed to emphasize the cultural alienation of India's only Muslim majority state.

By January 30, every woman and girl over the age of 10 will have to be veiled. Any one who fail to heed the warning are liable to have ink thrown in their faces. Hindus will be compelled to wear the 'tika' mark on their forehead to distinguish them.

In the muddy, traffic—choked alley was Shopkeeps were busy, yesterday painting their signs 'GREEN' the colour of prosperity under orders from a particularly hard line fundamentalist group called Allah's Tigers.

A torrent instruction pours forth endlessly from extremist organizations. Newsreaders on local broad casts of Indian state run radio and television have been told to stop mixing Hindi words with the Urdu language and instruction heeded immediately. Camera shops have been told not to display photo graphs of scantily clad people. Hindu and English—language films have been banned because they represent "Cultural domination". Coffee shops have been ordered not to sell tickets for lotteries, which are "Un-Islamic".

Everybody seems to be afraid politicians from the National Conference, longest—established political party in Kashmir, have virtually been driven underground. Everyday, dozen of people place advertisements in Urdu-language news papers declaring that they bear no alligiance to the party. Any link can be tantamount to death sentence.

Journalist to are second. Extremists tend to bomb the offices of newspapers that upset them. They have also let it be known that they want to be called "rebels" or "insurgents" but not "mililants".

In the past week Government Security forces looking for "subversive material" have raided an Urdu language weekly magazine 'Challan' and English language weekly 'Greater Kashmir.' But aplan to impose—draconian censorship has been abandoned after fierce protests from within India and internationally.

(২১) "আহমদ বুখারীর প্রধানমন্ত্রীকে ধমক"

দিল্লীর ইমাম বুখারীর ছেলে আহমদ বুখারী ইস্তাহার প্রকাশ করে কাশ্মীর বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে সতর্ক করেছে, সেই ইস্তাহারের প্রারম্ভ এই প্রকার—"নবযুবক বন্ধু এবং মাননীয় নাগরিকবৃন্দ, ইসলাম বিশ্বের উন্নতির মযহব (ধর্ম), আমাদের সম্পর্ক সেই সব অনুগামীদের সাথে, যারা নিজেরা ইসলাম মেনে নিয়ে, ঐসলামিক সন্দেশ অন্য ধর্মাবলম্বীদের নিকট রক্তস্নাত করেও পৌঁছে দিয়েছে। (এক সদ্য ধর্মান্তরীত বলছে, ১২'শ শতাব্দীর নয়, অজ্ঞানী রাজীব আর তথাকথিত সর্বধর্ম-সমভাব বাদীরা 'ইসলামের সন্দেশের' খেয়াল রাখুন) ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী আছে যে ইসলাম অন্যায়কারীর পাক্কা শত্রু। উর্দুশব্দ এইরকম—"বুজুর্গো ঔর নওজওয়ান সাথীয়োঁ ইসলাম সংসার কী উন্নতি কী মজহব হ্যায়, হামারা তাল্লুক উন উম্মত (অনুযায়ীত) সে হ্যায় জিসকে মান্‌নে ওয়ালোনে ইসলাম কা পৈগাম খুন মে নহাকর দুসরো তক পৌহুঁছায়া।

ইসলাম কি তারীখ গবাহ হ্যায় কি ইসলাম জালিম কা শদীদ (কট্টর) মুখালিক হ্যায়।"

ইস্তাহার আরও লিখছে কাশ্মীরের পরিস্থিতি এত ভয়ানক হতে চলেছে যে আমাদের সংঘবদ্ধ হয়ে উপায় করা প্রয়োজন, আমাদের ধার্মিক কর্তব্য আমাদের আহ্বান করছে, এদেশের মানুষ বিশেষ করে মজলুম (দলিত) ও সর্ব-অকলিয়ৎ (সংখ্যালঘু) এর সুরক্ষা করার চেষ্টা করা এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা। শক্তি এমন হওয়া চাই, যেন অত্যাচারীর বুক কেঁপে ওঠে। সাম্প্রদায়িকতা ও অত্যাচার সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য আমাদের তৈরী হতে হবে, মুসলমান, কখনও গুলিকে ভয় করেনি, (এখানে 'দলিত' ভুলে যাওয়া হল) তারা বুক ফুলিয়ে গুলি হজম করেছে। অধিকার প্রতিষ্ঠার আওয়াজ তুলতে ভয় পায়নি। অত্যাচারী শাসন ব্যবস্থা কখনও সহ্য করে নি।

মুফ্‌তিকে সতর্ক করে দিয়ে লিখছে—রুবিয়াকে মুক্ত করার জন্য কাশ্মীরের নওজওয়ানদের সাথে সওদা করতে পার, তাহলে এখন তাদের সাথে কথাবার্তা কেন বলা হচ্ছে না? তোমরা যদি কাশ্মীর বাঁচাতে চাও তাহলে, কাশ্মীরের তরুণদের সাথে কথাবার্তা বা আলোচনায় বসো। ["কাশ্মীরের তরুণ"—অর্থাৎ মুসলিম উগ্রবাদীরা (Subversives) এরাই কাশ্মীরের চালিকা শক্তি বা ভাগ্য বিধাতা—কি দুঃসাহসী প্রস্তাব]

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে মনে করিয়ে দিল যে, নির্বাচনের আগে দেওয়া 'প্রতিশ্রুতি' স্মরণ কর, তার উপর ভিত্তি করে শাহী ইমাম্ হিন্দুস্থানের শুধু মুসলমানদেরই নয়, দলিতদেরও আহ্বান করেছিল, জনতা দলকে বিজয়ী করতে—কংগ্রেসকে হটিয়ে দিতে। (মানে "ইসলাম" দলিতদের রক্ষাকর্তা হল—আর আম্বেদকর কোনায় পড়ে রইল)

ইস্তাহার, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে আরও মনে করিয়ে দিচ্ছে, কাশ্মীরের মুসলমানদের নির্বংশ করার জন্য তোমাদের আমরা মতদান করেছি কি? হরিয়ানার মদিনা গ্রামে চারজনের হত্যায় তোমরা অধৈর্য্য হয়ে পড়, মুখ্যমন্ত্রীকে অপদস্থ কর—তাহলে মুসলমানদের হত্যাকারী তংগনজর (সংকীর্ন মনোবৃত্তি), ফিরকাপ্রস্থ (জাত্যাভিমানি) শৈতানশিকতা (রাক্ষস-হৃদয়) (এই বিশেষণ ওরা রাজ্যপাল শ্রী জগ্‌মোহনকে দিল) জগ্‌মোহনকে সরাবার বাধা কোথায়?

চারমাস ধরে শাহী ইমাম্ চিৎকার করে বলছে জগ্‌মোহনকে দূর কর! এখনতো ক্ষমতাশীন ও বিরোধী দুই পক্ষের সদস্যরাই দাবী করছে। মীরওয়াইজ—মৌলবী ফারুক-এর শবযাত্রায় জগ্‌মোহন গুলি চালাবার নির্দ্দেশ দিল। একশজন কাশ্মীরীকে শহীদ করল। (কাশ্মীরী মানেই মুসলমান—এই অর্থে, শবযাত্রীরা পুলিশের ওপর হাত বোমা বর্ষন করল, সেকথা আহমদ্ কি করে লিখবে?) কাজেই জগ্‌মোহনকে হটাও!

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে ভয় দেখানো হল—যদি হুকুমত্‌নে (প্রধানমন্ত্রী) হমারী বাত্‌পর (আমার কথায়) তবাজা (ধ্যান) ন দিই (না দেয়) তো (তবে) কোই তরীকা তয় কিয়া জায়েগা কি হুকুমত্‌কো হটায় জাসকে!

ইস্তাহার অনেক লম্বা চওড়া। ১৯৯০ এর ১০ই জুন 'পাঞ্চজন্য' পত্রিকার চতুর্দশ পৃষ্ঠায় তা ছাপানো হয়েছিল!

(২২) "ফরমাশ পালন"

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং তার খলিফার (ধর্মগুরু) নির্দেশকে সম্মান দিল। জগ্‌মোহনকে দূর করল। মুসলিম উগ্রবাদীদের সাথে আলাপ আলোচনা করার বাসনাও তার কথাবার্তায় প্রকাশ পেতে লাগলো। একটা অবগুণ্ঠনের প্রয়োজন অর্থাৎ মুসলিম উগ্রবাদীরা বা বিভাজনবাদীরা সংবিধানের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে বললেই হল!

মাছ জলের বাইরে এসে মানুষের সাথে মিশবে নাকি মানুষ জলে ডুব মেরে মাছের সাথে মিলবে?

(২৩) "স্যেকুলারিজম মানেই হিন্দুবিদ্বেষ"

কাশ্মীর বিঘটনাবাদের প্রতিপালক হচ্ছে—হিন্দুস্থানের অন্যত্র অবস্থিত মুসলমানেরা আর এধরনের মুসলমানদের রক্ষক হচ্ছে—তথাকথিত স্যেকুলারবাদীরা। উর্দ্দু শুধু মুসলমানের ভাষা নয় এ ধরনের বক্‌বক্ করার মত তথাকথিত স্যেকুলারবাদীরা উর্দ্দু 'বাল-ভারতী'তে—"আজান" (আল্লার প্রার্থনার জন্য আহ্বান করা) "বজু" (আল্লার প্রার্থনার পূর্বে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধোয়ার ক্রিয়া) এইসব শব্দ ঢোকাল। পুস্তকের নির্মাতাদের শাসকীয় কোষ থেকে সাহায্য দেওয়া হল।

মহারাষ্ট্রে উর্দ্দু কার জন্য? পশ্চিম বাংলায় উর্দ্দু কার জন্য?—যে কোন প্রদেশে উর্দ্দু কার জন্য?

উর্দ্দু কোন প্রদেশের প্রাদেশিক ভাষা নয়!

উর্দ্দু একাডেমী মানেই স্যেকুলার হিন্দুস্থানের কোষাগার থেকে অর্থ বিতরণ করে ইসলামধর্মের প্রচারের সংস্থা।

জগমোহন জম্মু ও কাশ্মীরের ১৫৭টা বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করল বলে ১৩-৫-৯০ এর 'টাইমস্' এর মুম্বই সংস্করণের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হল! জমায়ত-এ-ইসলাম এইসব বিদ্যা প্রতিষ্ঠান চালাতো। এইসব বিদ্যা প্রতিষ্ঠানে বিযুক্তবাদী রাষ্ট্র বিরোধী শিক্ষা দেওয়া হত। 'ফলান এ আম' ট্রাষ্ট—এই সংস্থা অবৈধ বলে ঘোষণা করা হল!

স্যেকুলারিজমের সুযোগ নিয়ে, উর্দ্দু বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলো যে বিযুক্তবাদ (subversive) শেখাচ্ছে সেই পাপাচারের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমাদের এই তথাকথিত স্যেকুলার শাসন।

স্যেকুলার শাসন সংস্কৃতের গলা টিপে, সংস্কৃতি হত্যা করে উর্দ্দুকে এবং ঐস্লামিক অপসংস্কৃতিকে যে উৎসাহ দিল তা বিযুক্তবাদীদের অনুকূল হল। শাসন ইতিহাস ভুলে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্তুতে "শ্রী"—এই অক্ষর খোদাই করা ছিল। দেশ বিভাগের আগে মুসলমানরা এর বিরুদ্ধে জোরদার আন্দোলন করল। সংস্কৃত বিদ্বেষ ছিল এর মূলে। স্যেকুলারবাদীরা নিজেরাও সেই ভীতি কায়েম রাখলো। (১১৮, ১১৯ পৃ: লক্ষ্য করুন।)

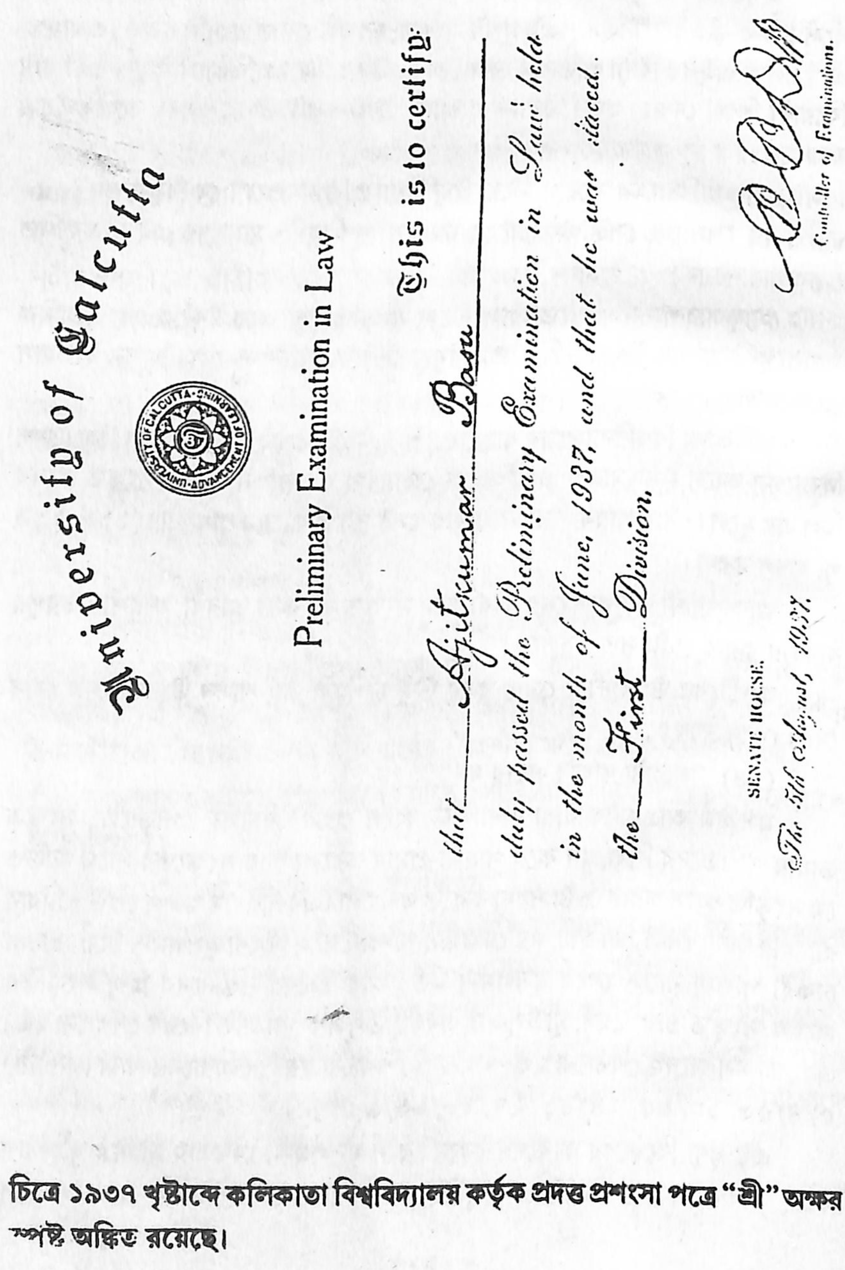
আকাশবাণী ও দূরদর্শনের কার্য্যক্রমে সংস্কৃত নষ্ট করে আরবী, ফারসীর ভরপুর ব্যবহার করার চেষ্টা সতত চলছে!

কাশ্মীরের উগ্রবাদীরা জোর করে উর্দ্দু চাপালে এই শাসন উগ্রবাদীদের দোষ দেবে কোন মুখে?

(২৪) "অজ্ঞানী থাকাই এদের ধর্ম"

মুসলিম আক্রমণকারীরা বিদ্যাপীঠ ধ্বংস করল। গ্রন্থালয় পোড়ালো, সংস্কৃত ভাষার পণ্ডিতদের শিরচ্ছেদ করে পাহাড়-প্রমান করলো আর সংস্কৃতের সাথে জড়িত যে সংস্কৃতি ধ্বংস করার চেষ্টা সর্বদা করতে থাকলো। এরপরিণাম স্বরূপ কেউ পরিবার বাঁচাবার জন্য, কেউ জিজিয়া কর দেওয়ায় অসমর্থ বলে কিংবা মুসলমান হয়ে ভালো চাকরী পাওয়া যাচ্ছে দেখে মুসলমান হত! আর তাদের সন্তানদের হিন্দু-সংস্কৃতির বিদ্বেষ, সংস্কৃত ভাষা-দ্বেষ, মূর্তিপূজার এবং মূর্তিপূজকদের প্রতি বিদ্বেষ শেখানো হত। এবং তা মসজিদেই শেখানো হত—আজও শেখানো হয়। (কোরানের পারা (অধ্যায়) ৫/৪/৫৬, ১০/৯৫, ২৪/৪১/২৭, ২৮/৬৬/৯ দেখুন)

এই ঘৃণ্য বিদ্বেষের কারণেই কোন কোন মুসলমান, দেবতার মন্দিরে মুত্রত্যাগ করে, আবার কেউ কেউ দেবতার মূর্তিতে বিষ্ঠা ফেলে,—ধার্মিক কাজ করল বলে


University of Calcutta

Preliminary Examination in Law

This is to certify

that Jitkumar Basu

duly passed the Preliminary Examination in Law held

in the month of June, 1937, and that he was placed

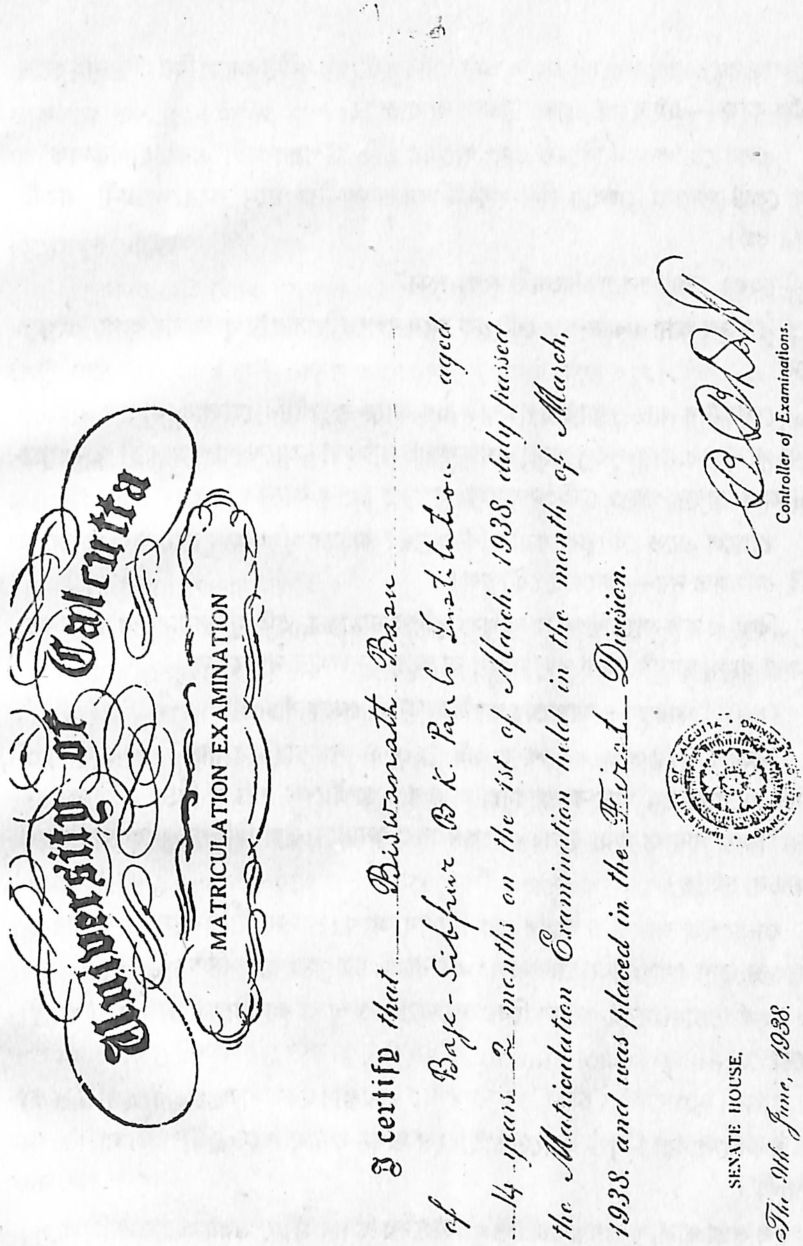
in the First Division.

SENATE HOUSE

The 5th August, 1937.

Controller of Examinations.

চিত্রে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রে "শ্রী" অক্ষর স্পষ্ট অঙ্কিত রয়েছে।


University of Calcutta

MATRICULATION EXAMINATION

I certify that Biswanath Basu of Baje-Sibpur B. K. Pal's Institution aged 14 years 2 months on the 1st of March 1938, duly passed the Matriculation Examination held in the month of March, 1938, and was placed in the First Division.

SENATE HOUSE.

The 9th June, 1938.

Controller of Examinations.

চিত্রে ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসা পত্রে "শ্রী" অক্ষর বিলোপ করা হয়েছে।

তৃপ্তিলাভ করে। কাফেরদের অর্থাৎ অন্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় কাজে বিঘ্ন ঘটানোই হচ্ছে ধার্মিক কাজ—এই হচ্ছে এদের বিশ্বাস বা ধারণা!

এসব যে 'পরধর্ম বিদ্বেষ' এবং অন্যের প্রতি 'উপদ্রবকারী' এবং 'হানিকারক' এ কথা কেউ তাদের শেখায় না। সর্বধর্ম-সমভাববাদীরা মনে করে অজ্ঞানী থাকাই এদের ধর্ম!

(২৫) "প্রচলিত মতবিরোধী অথচ সত্য"

একজন আর একজনকে কৌতুক করে বলছে "লোকটা মুসলমান অথচ সংস্কৃত জানে"

লোকটার বাড়ি কোথায়? মুম্বই এর কাছে রত্নাগীরি জেলায়, না হয় নাসিকে কিংবা পুনেয়! এদের পূর্বপুরুষরা এখানকারই বাসিন্দা। আশেপাশে মারাঠী ও সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষার গন্ধও নেই। সবসময় সংস্কৃত শ্লোক কানে পড়ছে।

তাহলে এতে কৌতুক করার কি আছে? বাস্তবে মুসলমান হয়ে সংস্কৃত জানে এটাই ধর্মসঙ্গত নয়—কাজেই কৌতুক!

কিন্তু এ হল ভ্রান্ত শিক্ষা যা অপসংস্কৃতির নামান্তর, তাই মুসলমানদের অজ্ঞানতা দূর করা হলে, তবেই তারা মানুষ হবে বা আর মুসলমান থাকবে না!

(২৬) "ফারুক,—আমাদের কাশ্মীর সমস্যা থেকে বাঁচাও"

'সকাল' পত্রিকায় ২৩শে জুলাই '৯০ এ সমাচার বেরোল, রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ বলেছেন ফারুক আবদুল্লার ওপর কাশ্মীরের দায়িত্ব দিলে সত্যিকারের অপরাধীদের সাহায্য করা হবে। খবরে আরও জানানো হল দিল্লিতে ফারুকের সাথে আলোচনা চলছে।

ফার্নাণ্ডেজ শাসকীয় যন্ত্রের এক বিশেষ অংশ। শাসন, নীতি হিসাবে যা করছে, ফার্নাণ্ডেজ তার খোলা বিরোধ করল। এর নামই বোধহয় রাজনীতি।

জর্জ, তোমাদেরই প্রস্তাব ছিল ফারুককে জম্মু ও কাশ্মীরের অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বানানো হোক।

(পাঞ্জাব কেশরী/জলন্ধর/২২-৬-৯০)

যখন তোমরা নিযুক্ত করতে চাইছিলে তখন ফারুক 'অপরাধী' ছিল না! এখন 'অপরাধী'।

সে কথা থাক, কারণ রাজনীতি ধুরন্ধরদের ডিগবাজী খাওয়াকে রাজনীতি বলে। "বারাঙ্গনৈব নৃপ—নীতিরনেক রূপা" (বারবনিতার যেমন অনেক রূপ তেমনি রাজনীতিবিদদেরও অনেক রূপ)

একলা মুফ্‌তি দ্বারা কাশ্মীর সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল হচ্ছে না দেখে, বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং, জর্জ ফার্নাণ্ডেজকে পাঠালো মুফ্‌তির সাহায্যে। সমস্যা জটিলতর হতেই

ফার্নাণ্ডেজ সরে পড়লো, ফারুক আবদুল্লার গুণাবলী ফার্নাণ্ডেজ প্রকাশ করল, তাঁর মতে ফারুককে কাশ্মীরের দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু কাকে দেওয়া ঠিক? একথা সে বললো না!

আমাদের শাসনের দৃষ্টিতে এমন একজনকে নিযুক্ত করতে হবে যার কিছু বিশেষগুণ আছে!

প্রথমতঃ সেই লোক মুসলমান হতে হবে! তারপর সেই লোককে কাশ্মীরী হতে হবে, কাশ্মীরের স্যেকুলার মানুষদের (অর্থাৎ বিভাজনবাদী মুসলমানদের, হিন্দুদের প্রশ্নই ওঠে না!) কাছে সেই নেতৃত্ব তাদের অনুকূল মনে হতে হবে।

সংবিধানের ধারা ৩৭০ অনুযায়ী, কাশ্মীরের বিশিষ্ট স্থান আছে, সেই প্রকার কাশ্মীরের 'স্যেকুলারিজমের'ও বিশেষ বৈচিত্র আছে। হিন্দুস্থানের অন্য প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী কোন মুসলমান হতে পারবে কিন্তু কাশ্মীরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী চলবে না! কারণ কাশ্মীর হিন্দুস্থানের "আদর্শ স্যেকুলার" প্রদেশ।

এ অবস্থায় কে বাকি রইল?

আব্দুল রহমান অন্তুলেকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মহারাষ্ট্রের গদীতে চাপানো হলে, লণ্ডন থেকে শিবাজী মহারাজের, তলোয়ার ফিরিয়ে আনার নাম করে হজ যাত্রার পুণ্য নিয়ে এলো—তলোয়ার নয়। (কোথায় সৌদি আরব আর কোথায় লণ্ডন)

গৃহমন্ত্রী মুফ্‌তী মহম্মদ সৈয়দও চার মুসলিম দেশকে কাশ্মীর প্রশ্নে হিন্দুস্থানের অনুকূলে আনার নাম করে—বিদেশ যাত্রা করল। বাস্তব স্থিতি এই যে, ফারুক আবদুল্লা তখন ইংলণ্ডে, তার সাথে সাক্ষাৎ করাই ছিল তার প্রকৃত উদ্দেশ্য। দিল্লীর 'বীর অর্জুন' পত্রিকা ২৪-৬-৯০ এ এই সংবাদ প্রকাশ করেছে। বীর অর্জুনের শিরোনামা ছিল "মূফ্‌তি লণ্ডনমে ফারুক সে মিলেঙ্গে"।

খবরে আর বলা হয়েছে, কিছুদিন আগে রেলমন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ যখন ওয়াশিংটনে গিয়েছিলেন, ফেরার পথে ইংলণ্ডে ফারুকের সাথে দেখা করেছেন। শুধু তাই নয় ইংলণ্ডে হিন্দুস্থানের উচ্চাযুক্ত (High Commissioner) কুলদীপ নাইয়ারও এর আগে অনেকবার আবদুল্লার লণ্ডনের বাসস্থানের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়েছেন। জগ্‌মোহন রাজ্যপাল থাকা পর্যন্ত কেন্দ্র শাসনের সাথে কোন আলোচনা করা হবে না—এই ছিল ফারুকের শর্ত।

মুফ্‌তি ঘুরে ফিরে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছালো। সমাচারপত্রে সমাচার ছাপানো হল, যে মূফ্‌তি ফারুকের সাথে দেখা করেনি। "দেখা করেনি"—এই সংবাদ এত জোর দিয়ে বলা হল যে এই লেখার পেছনে অলিখিত শব্দ পড়তে পাঠকের কোন অসুবিধা হল না!

ফারুকের গুরুত্ব আরও বাড়াবার জন্য চক্রান্ত করে এই সাক্ষাৎকার ঘটানো হল না। আসলে আবদুল্লা এবং মূফ্‌তি দুজন একই ব্যাপারে একজন আর একজনের

প্রতিদ্বন্দ্বি। ১৯৮৬ খৃঃ কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলে সমাবিষ্ট হওয়ার পর ১৯৮৬-র ৮ই মে মুফ্‌তী কাশ্মীরের মূখ্যমন্ত্রী হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছিল!

কাশ্মীরের বেশী সর্বনাশ কে করতে পারে—এই নিয়ে এই দুই প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল!

ফারুক আবদুল্লা নিজের সম্পূর্ণ গুরুত্ব আদায় করে নেবার পর আর বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর শাসন, অনেকবার ফারুকের পদলেহন করায় ফারুক প্রসন্ন হল! ও কাশ্মীর ব্যাপারে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে মার্গদর্শন করতে এগিয়ে এলো!

৬ই আগষ্ট, ১৯৯০, বেনজিরকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সরানো হল। হিন্দুস্থানের তাতে কোন লাভ হল না—লোকসানও হল না। হিন্দুবিদ্বেব ইসলাম বিস্তারবাদ পাকিস্তানের এই নীতি অক্ষুন্ন রইলো! হিন্দুস্থানের মুসলমানও সেই নীতির অনুকূলে। স্যেকুলার (?) শাসন তাদের উৎসাহ দিচ্ছে। হিন্দুস্থানের স্যেকুলার শাসনের মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির কোন পরিবর্তন হল না; বেনজিরের পদচ্যুতি কোন রামপ্রসাদ বা কোন হরি সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য করা হয়নি। তাই পাকিস্তানের ওলট্ পালটে হিন্দুস্থানের কোনো লাভও নেই কোন লোকসানও না!

ঠিক তেমনি হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী রাজীব রইল কিংবা বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং রইল, রাজীব পদচ্যুত হল কিংবা বিশ্বনাথ পদচ্যুত হল—ধর্মনিরপেক্ষতার, অর্থাৎ মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির পরিবর্তন হল না, হবে না! তাই এখানকার মুসলমানদের এবং সেজন্য পাকিস্তানের কিছুই যায় আসে না!—তারা সব সময়েই তৈরী জমি পেয়ে গেছে, পেয়ে যাবে!

'অন্দর কি বাত' ছিল এই যে বিঘটনবাদীরা ফারুককে সবুজ সংকেত দিয়েছিল কারণ বেনজির কাশ্মিরী বিঘটনবাদীদের সবুজ সংকেত পাঠিয়েছিল! সবুজ ফ্লাগের জনতা দলের নেতা বিশ্বনাথের শাসন। এই আলোতে গুপ্ত মন্ত্রনা করবে!

স্যেকুলারের চৌহদ্দিতে থেকে বিঘটন (subversion) এর সর্বগুণ আয়ত্ব করতে পারায় ফার্নাণ্ডেজের বর্তমান আক্ষেপের কোন মূল্যই নেই!

(২৭) "আরব দেশকে সাহায্যের জন্য ডাক"

"আরব এবং ইরান কাশ্মিরী বিঘটনবাদীদের সহায়ক"—আমেরিকা এ ধরনের মতপ্রকাশ করেছে। আমেরিকা কংগ্রেসের 'হুইপ' এ্যালন ক্রষ্টন্ ১৩ই জুলাই ওয়াশিংটনে বলেছেন "কাশ্মীরের দাঙ্গা-হাঙ্গামার পেছনে আরব ও ইরানের হাত আছে" (Indian Express ১৪-৭-৯০), আবার 'লোকসত্তার' ২৩-৭-৯০ এর সংস্করণে জুলাই এর ২২ তাঃ এর সংবাদ দিয়েছে, উর্জ্জা মন্ত্রী আরিফ মহম্মদ ইসলামী পরিষদ সংগঠনের অধ্যক্ষ, কুয়েতের অমীর শেখ জাভের-এর হাত পা ধরে প্রার্থনা করেছে—"হুজুর কাশ্মীরের ব্যাপারে আপনি মধ্যস্থতা করুন। পাকিস্তানকে বুঝিয়ে বলুন ভারতের সাথে আলোচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে।"

ইসলামী দেশকে আহ্বান করার জন্য বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং আরীফ খানকে স্যেকুলারত্বে "ছুন্নৎ" করে, পবিত্র (?) করে তাকে আরবদেশে পাঠালো!

কাশ্মীরের সমস্যা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নয়—একথা যে শাসন অনর্গল বক্ বক্ করে বলে, সেই শাসন এমন দেশের মধ্যস্থতা চাইলো—ইসলাম বলেই যে দেশ ভেতরে ভেতরে কাশ্মীরের বিঘটনবাদীদের সমর্থন ও সাহায্য করে।

যে লোক ইউ. এন. ও-তে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বতন্ত্র কাশ্মীর রাজ্য ঘোষণা করল, যাকে ধ্বংস এবং হত্যাকাণ্ডের অপরাধী হিসাবে হিন্দুস্থান পুলিশ খুঁজছে, সেই অমানুল্লাকে, তার সাথে সাথে যে দেশের সাথে বিবাদ, চলছে বলে আমাদের রাষ্ট্র-কর্তারা বলছে সেই দেশের প্রধানমন্ত্রীকে—অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিতে বেনজিরকে সমস্যা সমাধানের জন্য ডাকা, আর সেই পুণ্যকৃত্যের জন্য কাশ্মীর দিয়ে দেওয়া, হিন্দুদের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাদের অর্পন করা এসব বর্তমান রাষ্ট্র-কর্তাদের নীতির সাথে সুসংগত হবে!

এইরকম ভয়ঙ্কর এবং আত্মঘাতী পরিস্থিতির দিকে আমাদের নেতারা হিন্দুস্থানকে নিয়ে চলেছে।

(২৮) "বেনজিরের মুসলিম দেশ সফর"

যদি ইসলামীদের সহানুভূতির উপরই এই আভ্যন্তরীন সমস্যার সমাধান নির্ভর করে থাকে তাহলে সেখানে হিন্দুস্থানের চেয়ে বেনজিরের গুরুত্ব অনেক বেশী। কারণ বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর উপযুক্ততা কি? তার বিশেষত্ব কোথায়? না হিন্দুদের রক্তশোষণ করে মুসলমানদের সেবা করা। ইসলামের সংরক্ষক, (defender of Islam), এই ভূমিকা নেওয়া!

আর বেনজিরের ভূমিকা? ইসলামের প্রসারক! (expander of Islam) বেনজির ১৪টা ইসলামী দেশ সফর করল। এই যাত্রায় তার সাথে বিদেশ সচীব তন্‌বীর আহম্মদ খানও ছিল। O.I.C. অর্থাৎ Organisation of Islamic Countries—এর সদস্য দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের আগামী বৈঠকে পাকিস্তানের ভূমিকার অনুকূল প্রস্তাব নেওয়া হবে বলে পাকিস্তান আশা করছে। কাজেই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনার ওপর নির্ভর করে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না। কারণ সে পদ্ধতি যেমন আমরা জানি পাকিস্তানেরও তা জানা আছে।

(২৯) "হিন্দুসভা দ্বারা উদ্বাস্তুদের তালিকাভুক্তকরণ"

কাশ্মীর থেকে ভয়ে পালিয়ে আসা বা বিতাড়িত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের পটভূমি রচনা করার উদ্দেশ্য নিয়ে অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার দিল্লীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উদ্বাস্তু পরিবারদের নাম নথীভূক্ত করা শুরু হল! 'হিন্দুস্থান টাইম্‌স' ও অন্য সংবাদ পত্র ২৪শে ফেব্রুয়ারী ও ৩রা মার্চ এই সংবাদ প্রকাশ করল। মার্চ মাসে আড়াই হাজার

পরিবারের নাম নথীভূক্ত করা হল ! প্রত্যেক পরিবারে সাধারণত পাঁচ থেকে ছয়জন সদস্য তার মানে প্রায় ১৪/১৫ হাজার লোক দিল্লিতে পৌঁছেছিল। জম্মুতে এর চেয়েও বেশী লোক গিয়েছিল, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ ও অন্যান্য জায়গায় নিজেদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে অনেক পরিবার স্থানান্তরিত হয়েছিল !

জলন্ধরের 'দিনরাত' পত্রিকার ৯/২/৯০ এ এই পলায়নের এবং পাকিস্তানবাদী মুজাহিদাদের শয়তানী যোজনার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করল। সংবাদের শীর্ষক এই প্রকার—"শ্রীনগর সে ৪০ হাজার হিন্দু ও শিখোকা পলায়ন !"

'হিন্দু' ও 'শিখ' আলাদা আলাদা বলার রীতি তথাকথিত স্যেকুলারবাদী কংগ্রেস শিখিয়েছে! "হিন্দু-মুসলিম-শিখ, ইসাই আপোষ মে সব ভাই ভাই" এই ধরনের অর্থহীন ঘোষণা, মূল হিন্দুস্থানী ভূখণ্ড নিজেদের হাতে ভেঙ্গে টুকরো করে মুসলমানদের দেওয়ার পর, আর সেই পাপ ঢাকার জন্য আরও পাপ করার জন্য এরা দিতে শুরু করেছে, অনেক আগে থেকেই। এ কারণেই হিন্দু এবং শিখ ভিন্ন ভিন্ন বলে, কিছু বুদ্ধি ভ্রংশ, স্বার্থপর ও কুটিল শিখ নেতা ভবতে শুরু করে পৃথক 'পাঞ্জাবী সুবা' নির্মাণের ভ্রান্ত ও বে-আইনী দাবী করল। অন্তর্নিহিত সত্য এই যে—মুসলমানরা শিখদেরও ততটাই শত্রু মনে করে, যতটা অন্য হিন্দুদের, একথা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে।

যে সব পরিবারের নাম লেখানো হল তাদের মধ্যে অনেক উচ্চস্তরীয় শাসকীয় কর্মচারী এবং উগ্রবাদীদের হাতে মৃত হিন্দুদের আত্মীয়স্বজনও ছিলেন। সীমা সঞ্চালক (Boarder road Director), স্ত্রী-রোগ চিকিৎসক, মহিলা চিকিৎসক, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষক ইত্যাদি সমাজের মান্যগণ্য লোক এবং অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ীও ছিলেন। সামাজিক প্রতিষ্ঠার দরুন এদের পক্ষে ভিক্ষা করাও সম্ভব ছিল না। আর জীবনধারণ করাও ছিল কঠিন।

মুসলিম তুষ্টিকরণবাদী শাসন দ্বারা হিন্দুদের উপর পুনরায় চাপিয়ে দেওয়া এই দ্বিতীয় পর্যায়ের বৃহৎ ও ব্যাপকভাবে অত্যাচার পর্ব ; এই দিল্লিতেই আমি (লেখক গোপাল গোড্‌সে) দেখছিলাম !

যাদের পক্ষে নিজেদের বাসস্থান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া এবং তার জন্য বাহনের ব্যবস্থা ও তার ভাড়া বহন করা সম্ভব হয়েছিল, তারাই আসতে পেরেছে আর যারা লোকবল ও অর্থবলের অভাবে আসতে পারে নি, তারা এখনো পর্যন্ত উগ্রবাদীদের গুলির শিকার হচ্ছে !

হিন্দুসভা নিজেদের সাধ্যমতো অর্থ জোগাড় করে এদের মধ্যে বিতরণ করল। কয়েকটি পরিবারকে আশ্রয় দেবার জন্য কয়েকজন উদার ও দানশীল লোক এগিয়ে এলেন। তাঁদের সাহায্যে কিছু লোককে আশ্রয় দেওয়া হল !

উদ্বাস্তুদের অন্যত্র পুনর্বাসন করা—এটা সমস্যার সমাধান নয় !

(৩০) "মূফ্‌তী এবং উগ্রপন্থীদের মধ্যে সম্বন্ধ আছে—রাজীব"

রাজীব গান্ধীর বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্বনাথ প্রতাপ শাসন ইচ্ছাপূর্বক কাশ্মীর সমস্যা তৈরী করেছে। (যেন কাশ্মীর সমস্যা খুবই হাল-আমলের) উপত্যকা থেকে কংগ্রেস ও কনফারেন্সকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত রাষ্ট্রীয় মোর্চাই করেছে, J. K. L. F.-এর সাথে রাষ্ট্রীয় মোর্চা শাসনের সম্বন্ধ আছে, J. K. L.F.-এর সাহায্য নিয়ে কাশ্মীরে ক্ষমতা দখল সম্ভব কিনা—জগ্‌মোহন তা দেখছিল, মূফ্‌তি এবং কাশ্মীরের উগ্রবাদীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। (কংগ্রেস-মহাসমিতির বৈঠক দিল্লি, ২৪-৭-৯০ এর 'সকাল' পত্রিকার সংবাদ)

মূফ্‌তী, রাজীব শাসনকালেও মন্ত্রী ছিল। তখন তার সম্বন্ধ উগ্রবাদীদের সঙ্গে ছিল না কি? ন্যাশনাল কনফারেন্স এর ফারুক আজ রাজীবকে সাহায্য করছে। ফারুকের সাথে উগ্রবাদীদের সম্বন্ধ নেই কি? কাশ্মীর সমস্যা রাজীব শাসনকালে ছিল না? নাকি একজন আর একজনের ওপর পরে আর একজন অন্যজনের ওপর ক্রমাগত দোষারোপ করতে থাকবে? বর্তমান শাসন, কংগ্রেস শাসন থেকে ভিন্ন কি? মূফ্‌তি ও আবদুল্লার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সেইরকম বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং ও তার সমর্থক এবং রাজীব গান্ধীর মধ্যেও কোন পার্থক্য নেই!

স্যেকুলারিজমের ঔরসে মুসলিম তুষ্টিকরণ নীতির গর্ভের জারজ সন্তান—"কাশ্মীর সমস্যা"।

(৩১) "শাসকীয় (কাশ্মীরী মুসলিম) কর্মচারীদের দেশ নিষ্ঠা"

কাশ্মীরের শাসকীয় কর্মচারীদের কিছু অংশ ২৪-৭-৯০ থেকে হরতাল করছে। তাদের ছাঁটাই করা হয়নি—বদলি করা হয়েছে। সেই বদলি স্থগিত করার দাবী জানিয়ে তারা আন্দোলন করছে। ছাঁটাই কর্মীদের কাজে নাও এই দাবীও তারা করছে। (Times of India Bombay 27-7-90)

এই ১৩৭ জন কর্মচারী যারা আন্তর্জাতিক ন্যায়ালয়ের কাছে হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, এদের মধ্যে চারজন IAS অফিসারও রয়েছে!

অর্থাৎ এই বিভাজনবাদী কর্মচারীদের বেতন দিয়ে হিন্দুস্থান শাসন কাশ্মীরে রাজ্য শাসন করবে।

একজন উগ্রবাদীর আত্মসমর্পনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৪-৮-৯০ এ দূরদর্শনের সংবাদে প্রচারিত হল যে উগ্রবাদীদের সহানুভূতি দেখানো হবে এবং তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

রাষ্ট্রকর্তাদের খেয়াল রাখা উচিৎ যে নিরপরাধ হিন্দু উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের প্রয়োজন সর্বাগ্রে। উগ্রবাদীরা সহানুভূতির টুকরোয় সন্তুষ্ট নয়। তাদের রাষ্ট্রীয় আনুগত্য হিন্দুস্থান ছাড়া অন্য কোথাও গচ্ছিত। ঐ টুকরো তারা নেবে আবার হিন্দুস্থান বিরোধী কার্য-কলাপেও লিপ্ত থাকবে যেমন ৫৫ কোটি টাকা পকেটে গোঁজার পরেও পাকিস্তান

কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়নি। কোন কারণে বা যে কোন মূল্যেই তারা (পাকিস্তান) হিন্দুস্থানের সাথে সু-প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার বা সম্পর্ক রাখেনি। এমনকি পাকিস্তানের আসল জনক গান্ধীজীর চিতাভস্ম সিন্ধু নদীতে বিসর্জন করতে দেয়নি—এই বলে যে এক কাফের এর ভস্মে 'পাক' (পবিত্র) নদী তারা 'না-পাক' হতে দেবে না। এই হল পাকিস্তানের শয়তানী প্রবৃত্তি।

এই ধরনের সহানুভূতির নীতিতে পোষা হিংস্র ভূত একদিন রাজ্য এবং রাষ্ট্র কর্তাদের গলা চেপে ধরবেই। অনেক উচ্চপদস্থ অধিকারীদের হত্যা করা হয়েছে। অনেক শাসকীয় পদ (চাকরী) শূন্য পড়ে আছে।

মুসলিম উগ্রবাদীদের রাষ্ট্র অর্থাৎ পাকিস্তান তাদের সাথে আছে,—আর ঘরশত্রু বিভীষন অর্থাৎ হিন্দুস্থানের মুসলমানও তাদের সাথে আছে—একথা ভুললে চলবে না!

দেশনিষ্ঠা কেনার প্রচেষ্টা তথাকথিত স্বাধীনতা-পূর্ব কাল থেকেই বিফল হয়েছে; কারণ তা অস্বাভাবিক ও অপ্রাকৃতিক—আর তা থেকেই জন্ম হল পাকিস্তানের—এ ইতিহাস ভুলবার নয়!

লুটকরা সম্পত্তির মত একসময়ের লুটকরা লোকদের অর্থাৎ জোর করে ধর্মান্তরীতদের, বিকৃত করা সমাজকে সংস্কার ও শুদ্ধ করে নেওয়াই হচ্ছে আসল উপায়। নিষ্ঠা কেনা যায় না। নিষ্ঠা সংস্কৃতির সাথে আসে। আর এই কাজ হতে পারে একমাত্র শাসন কর্তাদের দ্বারা—অবশ্য দেশ বাঁচাবার ইচ্ছা থাকলে তবেই।

(৩২) "দম্ভোক্তি শেষ হয়েছে"

'হাজার বছর যুদ্ধ চালিয়ে যাবো'—

(এই দম্ভোক্তির প্রথম উদ্‌গাতা, জুলফিকার আলি ভূট্টো এবং পরে কন্যা বেনজির ভূট্টো, প্রথম জনের আর, ইতিহাসের আঁস্তাকুড় থেকে ফেরা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়া—পাকিস্তানী রাজনীতির নোংরা জলে ডুবন্ত প্রায়—দম্ভোক্তি শেষ হওয়ার এগুলোও কারণ—অনুবাদক), বেনজির ভূট্টোর এই হুমকীতে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং প্রতিহুমকী দিল—"হাজার ঘন্টা টিকতে পারবে কি?"

এই বাক্‌যুদ্ধ সমাপ্ত হয়েছে। "পাকিস্তান দুঃসাহস করলে তাকে কঠিন পরিণাম ভোগ করতে হবে"—এই দম্ভোক্তিও শেষ হয়েছে। আমেরিকা চোখ রাঙ্গাতেই সীমা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে!

(৩৩) "আক্রমণ হয়েছে"

পাকিস্তানী আক্রমণ অনেক আগেই আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু আক্রমণ মানে কি, হিন্দুস্থানের মানুষকে তা বুঝতে দেওয়া হচ্ছে না!

(৩৪) "অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপই পাকিস্তানী আক্রমণ"

"পাকিস্তান আক্রমণ করলে তবে?.........."একথা বারবার বলা হচ্ছে।

পাকিস্তান আক্রমণ কবেই আরম্ভ করেছে। কাশ্মীর এক দৃশ্যমান ভাগ মাত্র।

স্যেকুলারবাদের ষোলআনা লাভ নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে যুদ্ধ-সদৃশ বিচ্ছেদ সৃষ্টি করার পাকিস্তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। পাঞ্জাবের যারা শিখ নয় এমন হিন্দুদের হত্যা, আবার ইন্দিরা গান্ধীর হত্যার পর অন্যত্র শিখ হিন্দুদের দাঙ্গাজনিত হত্যা—এতে পাকিস্তান সফলতা লাভ করেছে। তারা সর্বাধিক আনন্দিত হয়েছে। শিখ নয় এমন হিন্দু এবং শিখ-হিন্দু এদের উভয়কেই পাকিস্তান শত্রু বলে মনে করে এসেছে। এত সংখ্যক শত্রু নিধন করার জন্য পাকিস্তানকে প্রচুর পরিমানে সৈন্য কাজে লাগাতে হত। অনেক সৈন্যকে বলি দিতে হত। তাছাড়া আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধ প্রবণতারও অভিযোগ আসতো। এ সবকিছু না করেও তাদের অর্ন্তঘাতমূলক কার্যকলাপের নীতির সফল প্রয়োগ হল! হিন্দুস্থানের মুসলমানরাও ততটাই আনন্দিত হল! কারণ তাদের শত্রু মারা যাচ্ছিল। আর সেই সময় এই স্যেকুলারবাদীদের (?) প্রদেশগুলোতে মুসলমানরা অর্থাৎ পাকিস্তানের এজেন্টরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত ছিল!

আগে যখন যুদ্ধ হত, তখন পাঞ্জাবের ঘর ঘর থেকে নাগরিকরা পুণ্য কাজ মনে করে সৈনিকদের খাবার জোগান দিত। যুদ্ধ, দেশের সুরক্ষার জন্য, মানে দেশের নাগরিকের সুরক্ষার জন্য এ ভাবনা ছিল তাদের প্রবল। আর আজ যুদ্ধ হলে সেই ঘরগুলো থেকেই পাকিস্তানী আক্রমণকারীদের খাদ্য যোগানো হবে।

কারণ পাকিস্তান, শিখদের খালিস্থান পাইয়ে দেবে—এই ভ্রম তাদের মাথায় গেঁথে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান, খালিস্থান তৈরী করার কাজে সাহায্য করবে। হিন্দুস্থানকে ভাঙ্গার জন্য। তারপর প্রথমাবধি শত্রু যে শিখ তাদের সংহার করা খুবই সহজ হবে এই উদ্দেশ্যে কারণ খালিস্থানীরা প্রধান হিন্দুস্থানী জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে!

কাশ্মীরে প্রথম প্রথম চরমপন্থী মুসলিম গোষ্ঠীরা মুসলিম নাগরিকদের উপরও একইরকম অত্যাচার করত। যেরকম অত্যচার তারা হিন্দু নাগরিকদের উপর করত! সেই প্রতিরক্ষা বিহীনতার ভয়ে মুসলমানরা হিন্দুস্থানের সামরিক কার্যকলাপের বিরোধ করত না!

আজকের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আজ পাকিস্তান-এর প্রত্যক্ষভাবে সৈন্য ঢুকিয়ে আক্রমণ করার প্রয়োজন নেই! অন্তর্ঘাতমূলক আক্রমণের তাদের যে পরিকল্পনা তা কার্যকরী হয়েছে। সেই আক্রমণ অনেক আগেই শুরু হয়েছে।

কাশ্মীরে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ রাখার, শুধু তাই নয়—শেখ আবদুল্লা থেকে শুরু করে সবাই পরিকল্পনা পূর্বক জম্মুতেও স্থানে স্থানে মুসলিম গরিষ্ঠতা বাড়াবার জন্য শত্রু কবলিত কাশ্মীরের মুসলমানদের ডেকে তাদের বসতি (Colony) করায়। আজ যুদ্ধ হলে সেইসব নাগরিকরাই আক্রমণকারীদের স্বাগত করবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থান তাদের দেখিয়ে দেবে। আর তা ধ্বংস করার জন্য সবরকম সাহায্য করবে!

(৩৫) "পাকিস্তানী বিস্ফোরক হিন্দুস্থানের সব জায়গায় ছড়িয়ে আছে।"

হিন্দুস্থানের হজ মঞ্জিল, মসজিদে, উর্দ্দু, মাদ্রাসা, আকাশবাণীর উর্দ্দু বিভাগ, উর্দ্দু একাডেমী, তব্‌লিগ (ইসলামের শিক্ষাপ্রচার কেন্দ্র) ও শাসনে অধিকারপ্রাপ্ত, মনোনীত বা নির্বাচিত এমন অনেক মুসলিম সদস্য ইত্যাদিদের সাথে যোগসূত্র রচনা করে পাকিস্তান গোটবন্ধন সম্পূর্ণ করেছে। তস্করের হাতে হিন্দুস্থানের আর্থিক পরিস্থিতি বিপর্যস্ত করার ভার দিয়েছে। (এখানে উল্লেখযোগ্য যে হিন্দুস্থানের Underworld gangstar, smuglar ও drug peddler দের মধ্যে বেশীরভাগ মুসলমান) আরবদের হিন্দুস্থানে টাকা খাটাবার জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা হচ্ছে!

সমুদ্র তটবর্তী এলাকায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এজন্য করা হচ্ছে যেন তস্করের উদ্যোগ সুরিক্ষত থাকে!

স্যেকুলারিজমের (?) দ্রুত প্রচারের জন্য অনেক সংস্থাকে নিযুক্ত করা হচ্ছে!

আকাশবাণী, দূরদর্শন, চলচিত্র ইত্যাদির ভাষা থেকে হিন্দি অপরাসিত করে আরবি, ফারসী শব্দ ঢোকাবার জন্য এবং সংস্কৃত ভাষা নষ্ট করার জন্য সংস্কৃতের প্রতি বিদ্বেষ শেখাবার জন্য হিন্দুদের ভেতর থেকেই অনেক এজেন্টদের বা দালালদের পাকিস্তান, এখানকার মুসলমানদের দ্বারা প্রচুর অর্থের লেনদেনে জড়িয়ে বা নিযুক্ত করে রেখেছে!

(৩৬) "জামা মসজিদ অন্তর্ঘাতের প্রধান কেন্দ্র"

কাশ্মীর মুসলমান বহুল, তাই কাশ্মীরের লড়াই মানেই মুসলিম শাসন স্থাপনের লড়াই। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর খলিফা, অর্থাৎ আবদুল্লা বুখারী সহ সব মুসলমান লড়ছে। হিন্দুস্থানের সীমা কাশ্মীর থেকে কমিয়ে হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানা পর্যন্ত সীমিত করতে পারলে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ ও বিহারে মুসলিম স্বাতন্ত্রের জন্য লড়াই করার মার্গ আরও সহজ হবে!

বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং পটভূমি রচনা করে দিয়েছে। ৫০ লাখ টাকা এমন একটা মসজিদ সুশোভিত করার নাম করে শাসকীয় কোষ থেকে দেওয়া হল, যে মসজিদ একসময় ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের বৃহৎ ও সুন্দর মন্দির ছিল। পেছনের দিকে সিঁড়ি ভেঙ্গে ভিন্ন পাহাড়ের দেওয়াল তৈরী করা হল। মূর্তি ধ্বংস করা হল, মন্দিরের চূড়ার অস্তিত্ব এখনও আছে, তা সত্ত্বেও, এই বাস্তু আজ মসজিদ নামে পরিচিত এবং এই মসজিদের প্রধান এমন একজন লোক যে, খোমেনীর বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে, ইরান পর্যন্ত ভ্রমনের সুযোগ ছাড়ে না এবং সেজন্য শাসকীয় সংরক্ষিত অধিকোষ সংস্থা (Indian Reserve Bank), প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাও করে দেয়—এই আমাদের স্বরাজ্য বা স্বরাষ্ট্র!

জামা মসজিদ হিন্দুস্থানের বিঘটনবাদীদের এক প্রধান সজীব কেন্দ্র। এই কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর কৃপাদৃষ্টি রয়েছে!

আবার সেই কেন্দ্র থেকেই বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংকে রূঢ় ভাষায় সাবধান করে দেওয়া হয়। "আহমদ বুখারীর প্রধানমন্ত্রীকে ধমক"—এই শীর্ষকে তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে!

(৩৭) "অন্য মুসলিম সংস্থা ও ব্যক্তির—কাশ্মীর বিষয়ে বক্তব্য"

আহমদ বুখারীর পত্রে বিভাজনবাদ তো স্পষ্ট হয়েছেই, অন্য মুসলিম সংস্থাগুলি কাশ্মীর বিষয়ে কী মনোভাব পোষণ করে, তা দেখলে—বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। দিল্লীর মাওলনকর হল-এ ১৯৯০ এর ২২ ও ২৩ শে জুন মুসলিম লীগের রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হল। অধ্যক্ষ ছিল সুলেমান্ সেইট্। তার বক্তব্য—কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে রাষ্ট্রীয় মোর্চা শাসন অসফল হয়েছে। জগ্‌মোহন (আগের রাজ্যপাল), 'চেঙ্গিস খান', কিংবা 'হিটলার' ছিল। "আজাদী কে বাদ কাশ্মীরী ভাইওঁকে সাথ কভী ইন্‌সাফ (ন্যায়) নহী কিয়া গয়া। কাশ্মীর কী জমীন পর তো সরকার কব্জা চাহ্‌তী হ্যায়, পর ওঁহা রহনেওয়ালে লোগোঁকো আপনানে কো তৈয়ার নহী হ্যাঁয়।"

অন্য বিষয়ে তার বক্তব্য—"বাবরী মসজিদ টুটি তো দেশ মে ধর্ম নিরপেক্ষতা কা জনাজা (শবযাত্রা) নিকাল জায়েগা। শঙ্করাচার্য্য কী গ্রেপ্তারী কে লিয়ে মুলায়ম সিংকো বধাই (ধন্যবাদ)। হরিজন অগর আপনি মর্জীসে ইসলাম কবুল করে তো উসে মিলনেবালী বিশেষ সুবিধাঁয়ে বন্‌ধ হো জাতী হ্যায়। ইয়ে দেশ মে মুসলমানোকে সাথ ভেদভাব হো রহা হ্যায়। অল্পসংখঁক আয়োগ (Minority Commission) কো ফরেন কানুনী অধিকার দিয়ে যায়ে, ইস্ আয়োগ কা অধ্যক্ষ কেবল কোই মুসলমান হী হো। সরকারী নোকরীওঁ মে মুসলমানোঁ কো উনকী আবাদী (লোকসংখ্যা) কে অনুপাত মেঁ আরক্ষন (Reservation) দিয়া যায়।" (জনসত্তা ২৫-৬-৯০)

ফারুক আবদুল্লার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিগঠিত কাশ্মীর বিধানসভার সদস্য আবদুল রসীদ দর্ এক জনসভায় আহ্বান করল যে ন্যাশনাল ফ্রন্ট কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টকে সম্পূর্ণ সহযোগিতা দিক। সাথে সাথে ফারুক আবদুল্লাকেও লিবারেশন ফ্রন্টের শক্তি বাড়াতে ও কাশ্মীরের স্বাধীনতার জন্য একত্রিত হতে আহ্বান করল।

ফারুকের অন্য মিত্র মুবারক্ গুলন্, ন্যাশনাল ফ্রন্ট থেকে পদত্যাগ করে লিবারেশন ফ্রন্টে যোগ দিল এবং একে শক্তিশালী করতে আহ্বান করল!

কাশ্মীরের ভূতপূর্ব সূচনামন্ত্রী আলী মহম্মদ সাগর বলল যে ফারুক, কেন্দ্রের দেওয়া, মুসলমানদের পক্ষে অহিতকর প্রস্তাব মেনে নিলে পার্টিতে বিদ্রোহ হবে। (দৈনিক প্রভাত, মীরাট ২৮-৬-৯০)

দর্, সাগর ও গুলন্ হিন্দু পরিবার থেকে আসা ধর্মান্তরীত মুসলমান, তাদের মধ্যে বিভাজনবাদ এলো। এককালে তাদের ধর্ম বদল হয়েছিল আর আজ বদল হল রাষ্ট্রীয়তা।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে উৎপন্ন যে কোন চিহ্ন বা স্মৃতি তাদের কাছে আজ নিন্দনীয় এবং অসহ্য।

—এভাবে "ধর্মান্তর", "রাষ্ট্রান্তরে" পরিনত হল।

এই হচ্ছে মুসলিম সংস্থা ও মুসলিম নেতাদের বিচার, সেই জন্যই দিল্লিতে মুসলমানদের সভায় "কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য অংশ ও সেখানে জনমত গ্রহণের প্রশ্নই ওঠে না!" একথা বলা মানেই জঘন্য হঠকারিতা,যা শুধু চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়!

(৩৮) "কাশ্মীর আমাদের—ভারতীয় জনতা পার্টির প্রস্তাব"

ভারতীয় জনতা পার্টি মাদ্রাজ অধিবেশনে প্রস্তাব নিল "কাশ্মীর হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য অঙ্গ"। (২৩-৭-৯০)

তোমাদের এ ধরনের প্রস্তাব নেবার আবশ্যকতা পড়ল কেন? তোমরা আজও শাসনের অবিভাজ্য অংশ। তোমরা তোষামুদে—এ অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে থাকলেও তোমরা মুসলমান—তোষামোদকারী—এ ধরনের অধিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে কারও নেই!

মুসলিম পক্ষগুলি এ ধরনের প্রস্তাব নিতে পারে, কারণ তারা "দেশের প্রতি অনুগত" নিজেদের এ ধরনের ভাবমূর্তি তৈরী করে হিন্দুস্থান শাসনের কাছ থেকে অর্থ এবং অন্য সুযোগ সুবিধা আদায় করবে।

তোমাদের যদি প্রস্তাব নেবারই ইচ্ছা ছিল তবে লাহোর আমাদের, পেশোয়ার আমাদের, রাওলপিণ্ডী আমাদের, আর ঢাকা আমাদের—আমরা তা অধিকার করবই করব!—এ ধরনের প্রস্তাব নেওয়া উচিৎ ছিল! যা, তোমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজেদের হাতেই আছে, তার জন্য নতুন করে প্রস্তাব নেওয়া কেন?

নির্বাচনের সময় ৩৭০ ধারা রদ করব বলে জনতাকে 'বোকা' বানালে আবার রাষ্ট্রীয় মোর্চাকে সমর্থন দেবার সময় "ধারা ৩৭০ যেমন আছে সেইরকম থাকবে"—বলে প্রতিশ্রুতি দিলে। তখন ভোটের প্রয়োজন ছিল। এখন প্রয়োজন গদী টিকিয়ে রাখার!

তবুও 'কাশ্মীর আমাদের'—এ প্রস্তাব না নিলেও তোমাদের ভোটও কমতো না। আর ক্ষমতা গ্রহণকারী দলের সাথে তোমাদের সম্বন্ধও যেরকম ছিল, সেরকমই থাকতো!

(৩৯) "যদি ইসলামী আক্রমণ না হত?"

এই দেশের উপর যদি ইসলামী আক্রমণ না হত? তবে জ্ঞান বিস্তার লাভের মার্গ থাকতো অক্ষুন্ন। কৃত্রিম উপগ্রহের প্রচেষ্টা, ২/৩ শ বছর আগেই হিন্দুরাষ্ট্র সম্পন্ন করত। আজ, বিজ্ঞানে যে দেশ অগ্রসর সেই দেশকেও আমাদের দেশ বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সাহায্য দিত। অথবা আক্রমণকারী যদি স্থানীয় লোকদের জ্ঞান বিকাশের প্রচেষ্টার

প্রশংসা করত, তাদের উৎসাহ দিত, গ্রন্থালয়ের যত্ন নিত, সৌন্দর্য ধ্বংস না করতো, কলা নষ্ট না করতো এবং শিল্পীদের সংহার না করতো—তাহলে এই জ্ঞান বিস্তারের ধারা অবিরত থাকতো।

(৪০) "ইসলামের বুনিয়াদই হচ্ছে ধ্বংস"

আসলে ইসলামের বুনিয়াদই হচ্ছে ধ্বংস আর ধ্বংসের মূল হচ্ছে উৎপীড়নকারী অন্ধ-বিশ্বাস। আমরা বলি "ধর্মান্ধ"। আসলে ধর্মান্ধ নয়। "অধর্মান্ধ"। ধর্মে কেউ অন্ধ হয় না। ধর্মে দৃষ্টি আরও বাড়ে। অধর্মে মানুষ অন্ধ হয়, অজ্ঞানে অন্ধ থাকে আর ঐ অজ্ঞানকেই জ্ঞান মনে করে পূজা করলে জ্ঞান বিকাশের সম্ভাবনাই শেষ হয়।

হিন্দুস্থানের এই অভিজ্ঞতা প্রায় কয়েক হাজার বছরের। জ্ঞান বিকাশের আশ্রয়ে থেকে সংঘর্ষ করে করে হিন্দুজাতি টিকে আছে।—সেই হিন্দুরাষ্ট্র। অজ্ঞানের নাশ করার জন্য। অন্ধশ্রদ্ধা নির্মূলের জন্য, সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। কাশ্মীরের ঘটনা, তৈরী হওয়ার সংকেত দিল। দামামা বাজলো। কাশ্মীরে যে সংঘর্ষ হবে তা হবে অজ্ঞানের বিরুদ্ধে জ্ঞানের, অন্ধশ্রদ্ধার বিরুদ্ধে জ্ঞান-প্রসারণের সংঘর্ষ। আর অন্ধশ্রদ্ধা সর্বত্র আছে বলেই, এই সংঘর্ষ শুধু কাশ্মীরেই সীমিত নয়!

(৪১) "দেশ বাঁচাতে হলে—প্রজার দেশানুগত্য প্রয়োজন"

'কাশ্মীরে অধিকার চাই, কিন্তু সেখানকার নাগরিকদের অন্তর্ভূক্ত করে নিতে, মানিয়ে নিতে শাসন রাজী নয়'—এই হচ্ছে মুসলিম লীগের অভিযোগ, সোজা অর্থ এই যে, ভূমির অধিকার নিতে হলে প্রজাদেরও অন্তর্ভূক্ত করে নিতে হবে। তাহলে প্রজাও এমন হওয়া চাই তারা যেন অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার যোগ্য হয়, মানিয়ে নেওয়ার যোগ্য হয়—অর্থাৎ প্রজাদের অবশ্যই দেশের প্রতি আনুগত্য থাকা চাই!

১৩৭ জন কর্মচারী নিজেদের আসল চেহারা দেখালো, তা তাদের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়া হয়নি বলে নয়—তাদের আনুগত্য অন্যত্র ছিল বলে।

হিন্দুস্থানের অবিভাজ্য ভাগ সেখানকার প্রজাসহ রাখতে হলে প্রজা এমন হওয়া চাই যাদের রাজনৈতিক, সামাজিক কিংবা সাংস্কৃতিক আনুগত্য অন্য দেশের ওপর নেই।

কাশ্মীর আমাদের রাখতেই হবে। অন্যথা শত্রুর সীমা শুধুমাত্র হিমাচল প্রদেশ ও হরিয়ানা পর্যন্তই নয়, দিল্লির জামা মস্‌জিদে পর্যন্ত পৌঁছাতে সময় লাগবে না।

আমরা শত্রুদের ঘরে নিলাম, আশ্রয় দিলাম। নিজেরাই নিজেদের শত্রু হলাম। নিজেদের ছায়াকেই নিজেরা ভয় করতে লাগলাম। এখন আমাদের নিজেদের উদ্ধার নিজেদেরই করতে হবে। অন্যে এসে আমাদের উদ্ধার করবে না!

উদ্ধারেদাত্মনায়ত্মানং নাত্মানম ওসাদয়েত্"

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈও রিপুরাত্মনঃ"

(অধ্যায় ৬ শ্লোক ৫ গীতা)

সংঘর্ষ, ভয়ানক সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী তা শুধু কাশ্মীর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। পাকিস্তান ব্যূহরচনা করেছে। কাশ্মীরের বিঘটনবাদীদের হিন্দুস্থানের অন্য যে যে কেন্দ্র থেকে সাহায্য করছে সে সব কেন্দ্র সংঘর্ষ বিন্দু হবে।

(৪২) "সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ"

কাশ্মীরে কার্যরত সংরক্ষিত আরক্ষীবাহিনী অর্থাৎ রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স ও আধা সৈনিক দল অর্থাৎ প্যারা মিলিটারী ইউনিট্ ও সৈন্যরা, শাসকীয় নীতি সম্বন্ধে শুধু সন্দিহানই নয় উপরন্তু অসন্তুষ্টও। 'গুলি খাবে কিন্তু গুলি চালাবে না'— এ ধরনের অলিখিত আদেশ থাকায় তাদের জিজ্ঞাসা, গুলি খাওয়ার জন্য আমাদের বন্দুক নেওয়ার কি প্রয়োজন? দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেমন বলি উৎসর্গ করা হয়, বিভাজন বাদীদের সন্তুষ্ট করার জন্য আমাদের বলি দেওয়া হচ্ছে কি? কাশ্মীরের সংরক্ষণের জন্য আমাদের এতদূর থেকে আনা হল, অথচ সংরক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বিঘটনবাদীদের। আর আমাদের বলি হিসাবে উৎসর্গ করা হচ্ছে।

তার উপর আবার 'সংখ্যালঘুদের ভর্ত্তি করলে বিভাজনবাদী-প্রবৃত্তি কমে আসবে শাসনের এই ধরনের আত্মঘাতী নীতির ফলে ১০/১৫ জনের দলের মধ্যে ৩/৪ জন মুসলমান ঢোকানো হয়। সৈনিকদের কাজ হয় আরও কঠিন। তাদের মনে শঙ্কা জাগে 'ওই মুসলমানরা উগ্রবাদীদের সাথে হাত মিলিয়ে, ষড়যন্ত্র করে কোন অসতর্ক মুহূর্তে সুযোগ বুঝে মেরে পালাবে না তো?'

উপরিল্লিখিত পরিপ্রেক্ষিতে সমস্ত অধিকারী নিজেদের মনের ভাবনা স্পষ্ট করে প্রকাশ করে না। এই শাসনকর্তারা সৈনিকদের বলি দেবে, আর কাশ্মীরও হাতছাড়া করবে—এ ধরনের আশংকা ও প্রতিকারহীনতার কথা ভেবে তাদের মন সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে বলে অনুমান করা যায়।

আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সৈনিকদের অস্ত্র ব্যবহার করতে না দিলে সৈন্য পিছিয়ে আসে ও সুরক্ষিত জায়গায় আশ্রয় নেয়—এটা যুদ্ধের নিয়ম।

(৪৩) "বাঁচার জন্য পরিকল্পনা চাই—আত্মনাশের জন্য নয়"

আত্মধ্বংসের জন্য কোন পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না। সেই কাজ আক্রমণকারী করতে থাকে! ব্যাপকভাবে বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে বাঁচবার জন্য, অধিকার সহ বাঁচবার জন্য, যৌথভাবে বাঁচবার জন্য পরিকল্পনা চাই!

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে কর্নাবতীতে হিন্দু সহাসভার অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে স্বাতন্ত্র-বীর সাভারকর হিন্দুস্থানে দুই রাষ্ট্রের অস্তিত্বের বাস্তব স্থিতির স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলিম তুষ্টিকরণ ঢাকবার উদ্দেশ্যে তাঁর সেই ভাষণের অত্যাধিক অপপ্রচার করা হল।

স্বাতন্ত্র-বীর সাভারকর যা বলেছিলেন হুবহু ইংরাজীতে উদ্ধৃত করা হল !—

Two antagonistic nation living in India side by side.

As it is there are two antagonistic nation living side by side in India. Several INFANT-LIKE—Politician commit the serious mistake in supposing that India is already welded into a harmonious nation, or that it could be welded thus for the mere wish to do so, these are well meaning but unthinking friends take their dreams for realities. That is way they are impatient of communal tangles and attribute them to communal organization. But the solid fact is that the so called communal anestions are but a legacy handed down to us by centuries of a cultural, religious and national antagonism between the Hindus and the Moslems. When time is ripe you can solve them, but you can not suppress them by merely refusing recognitior of them. It is sater to diagnose and freat deep seated disease than to ignore it. Let us bravely face unpleasant facts as they are. India cannot be assumed to day to be a unitarian and homogeneous nation, but on the contary there are two nations in the main ; the Hindus and theMoslemsin India. And as it has happened in many a country under similar situation in the world the utmost that we can do under the circumstances is to form as Indian State in which none is allowed any special weightage or representation and none is paid an extra price to buy his loyality to the state. Mercenaries are paid and bought off not sons of the Motherland to fight in her defence. The Hindus as a nation are willing to discharge their duty to a common Indian state on equal footing. But if our Moslem countrymen thrust on a communal strife on the Hindus and cherish anti Indian and extra territonal designs of establishing a Mohammedan rule or supramacy in India then let the Hindus look to themselves and stand on their own legs and fight single handed as best as they can for the liberation of India from any non Hindu yoke, but it English or Moslem or otherwise.

Veer Savarkar

19th Session Akhil Bharat Hindu Mahasabha at Karnabati (Ahemedabad) Samagar Savarkar Vanmaya Vol VI pp. 296.

রোগ আছে, অথচ তার চিকিৎসা করিয়ে নিতে ভয় হয় ; কারণ রোগের প্রকৃত কারণ লোকে জানতে পারলে সম্মানে আঘাত লাগবে—এ ধরনের ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ যেমন তখন ছিল, তেমনি আজও রয়েছে। কাশ্মীরে হিন্দু-বিদ্বেষী পরিবেশ ছিল এবং আজও আছে। একথা চাপা দেওয়া হয়েছে, চাপা দেওয়া হচ্ছে।

দেশের আজকের পরিস্থিতি আগের পরিস্থিতিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। তুষ্টিকরণ নীতির জন্য হিন্দুস্থানে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আছে, খৃষ্টান রাষ্ট্রের অস্তিত্বও আছে। আর স্যেকুলার (?) শাসন তা মেনে নিয়েছে। শাহবানো ঘটনায়

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় 'মহিলা' হিতকে প্রধান স্থান দিল। কিন্তু স্যেকুলার শাসনের কাছে 'মোল্লা হিত' শ্রেষ্ঠ মনে হল! স্যেকুলার শাসন ইসলামী শারিয়তী নিয়মকে মান্যতা দিয়ে, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের সম্মান ধূলিতে মিলিয়ে দিল। নাগাল্যাণ্ড ও মিজোরামের নির্বাচনে—শিক্ষা-সংস্থায় খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, এবং তা পালন করাও হল। আর ইসাই রাজ্য 'স্যেকুলার' শাসন থেকে মান্যতা পেল!

সংস্কৃত শিক্ষক বিদ্যালয়ে 'অথর্ব-বেদ' শেখালো বলে স্যেকুলার শাসন বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে ঐ শিক্ষককে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করল। "হিন্দুরাষ্ট্র"—এই স্বাভাবিক ধারণার অস্তিত্ব লোপ করা হল।

অহিন্দুদের ন্যায্য স্থান কোথায়, তা দেখাবার সময় এসেছে। তাদের 'একরাষ্ট্রে' কি ভাবে সমাবিষ্ট করা যায় তার রূপরেখা তৈরী করতে হবে। নাগরিকের অধিকার এবং নাগরিকের কর্তব্য কি এর নিয়মাবলীও স্পষ্ট করে সামনে রাখতে হবে!

(৪৪) "হিন্দুত্ববাদ-মানবতাবাদের অন্য নাম"

হিন্দুত্ববাদ জরাজীর্ণ দর্শন নয়। এ হচ্ছে জ্ঞানের মার্গ, জ্ঞান বিকাশের মার্গ, পরম্পরা ও অজ্ঞানতার জন্য যে দোষের সৃষ্টি হয়েছে তা আমরা দূর করতে পারবো। বিশ্ব থেকে জ্ঞান নিতে হয়, অজ্ঞান নয় বা অন্ধ বিশ্বাস নয়। "সর্বধর্মসমভাব"—এই ধারণা দাসবৃত্তি থেকে, ভয় থেকে ও অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়েছে। ধর্ম অনেক একথা মানবার মত ভুল আমরা এ থেকে করছি। মানবধর্ম হচ্ছে প্রকৃত ধর্ম, যা মানবতার উপকারী,—তাই গ্রাহ্য—তাই ধর্ম। যা মানবতাদ্রোহী তা অধর্ম, এই বিশাল ও ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে হিন্দুরাষ্ট্রের সংবিধান তৈরী করা প্রয়োজন।

(৪৫) "হিন্দু রাষ্ট্রের সংবিধানের কাঠামো"

কেউ শঙ্করের পূজা করতে চায়—শঙ্করের পূজা করুক। জৈন মন্দিরে যেতে চায় অবশ্যই যাক। গুরু "গ্রন্থ সাহেব" শ্রবণ করতে চায়—আনন্দের সঙ্গে করুক। বুদ্ধকে দেবতা মেনে জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ করতে চায় তা অবশ্যই করতে পারে। আম্বেদকরের মূর্ত্তির সামনে ধ্যান করার ইচ্ছা হয়েছে করতে থাকুক। শুধু যজ্ঞ করার ইচ্ছা হয়েছে? কর। মূর্ত্তি পূজা করতে চাও না? করো না! কেউ নিরিশ্বরবাদের প্রচার করতে চায় করতে পারে। একেশ্বরবাদের প্রচার করতে চায়—অবশ্য করুক। এ সব কিছু করার স্বাধীনতা থাকবে অন্যপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষ না করে।

মূর্ত্তি পূজকরা সব কাফের। হারামের মাস শেষ হলে তাদের ধর, তাদের হত্যা কর এ ধরনের উপদেশ দেওয়া ও সেই প্রার্থনাস্থলকে পবিত্র মানার মত উন্মাদ স্বাধীনতা এখানে অবশ্যই থাকবে না।

আরব দেশে যানবাহন ডানদিকে দিয়ে চালায় আমি মুসলমান তাই আমার বাহন ডানদিক দিয়েই চালাবো—এই ধরনের পরিবহন বিরোধী নীতির স্বাধীনতা এখানে থাকবে না!

আমি মুসলমান, তাই আমি অনেক বিবাহ করব, অনেক সন্তানের জন্ম দেব, 'গরিবী হটাও' এই ঘোষণার সাথে আমার কোন সম্বন্ধ নাই—এ ধরনের সমাজদ্রোহী ও দেশের অর্থব্যবস্থার ক্ষতিকারক কাজ এখানে নিষিদ্ধ থাকবে। পরিবার নিয়োজনের মত মানবিক ব্যবস্থার বিঘ্ন সৃষ্টিকারী স্বাধীনতা এখানে থাকবে না।

আমি মুসলমান, তাই আমি আমার সন্তানের জন্য নামের আমদানী আরবদেশ থেকে করব এই ভ্রান্ত স্বাধীনতা, এই মৌলিক বিচ্ছেদবাদী ভাবনা এখানে চলবে না। এখানকার নিঃস্বর্গের ওপর প্রেম না থাকলে তবে এখানের নাগরিকত্বও নাই, স্থানও নাই!

বাবর, আকবর, আলাউদ্দীন, তৈমূর, মহন্মদ কাশিম, তুঘলক্ নাদির, চার্চিল, জর্জ, ঝেভিয়ার এইসব নাম একে তো আমদানী করা দ্বিতীয়ত এই সব নাম স্থানীয় লোকের ওপর জোর করে চাপানো ও সংস্কৃতি থেকে অপসংস্কৃতির দিকে নিয়ে যাবার মতো। আর তৃতীয়ত এইসব নাম রাষ্ট্রের শোভা বাড়ায় না। বিজাতীয় এই নামগুলি হিন্দু সভ্যতা বিরোধী। এদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানীদের মাথা কেটে পাহাড় রচনা করে নিজের উন্মত্ত ও অত্যাচারী অন্ধশ্রদ্ধা ইতিহাসের পাতায় অঙ্কিত করে গেছে!

তীর্থস্থান মানতেই হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা যেমন থাকবে না দেশের ভেতরের কোন বিশেষ তীর্থস্থানকে জানতে হবে এমন কোন বন্ধনও না। তেমনই দেশের বাইরের কোন স্থানকে তীর্থস্থান মানতে হলে—এখানে নাগরিত্বও নেই, স্থানও নেই। কারণ ঐ তীর্থস্থানে হিন্দুস্থানের ঐ ধর্মাবলম্বী নাগরিকরা যেমন যায় তেমনি অন্যদেশের ঐ ধর্মাবলম্বী হিন্দুস্থান বিরোধী নাগরিকরাও যায়, কাজেই হিন্দুস্থান বিরোধী যোগসাজোস ঐ তীর্থস্থানে বসেই হয়।

মৃত্যুর পরেও মৃতদেহর জন্য ভূমির দখলদারী স্বাধীনতা এখানে থাকবে না! মৃত দেহের শেষ কাজ যেখানে যেরকম উপলব্ধ থাকবে সেইরকম আধুনিক সামগ্রী দিয়ে করতে হবে!

মহিলাদের সারাজীবন অবগুণ্ঠিতা রাখা, তাদের অশিক্ষিত রাখা—মানবতা বিরোধী স্বাধীনতা এখানে থাকবে না!

খেলায়, স্বীয় (একই) প্রার্থনা পদ্ধতিতে বিশ্বাসী কোন বিদেশী দলের জয় হলে স্বদেশ বিরোধী দুষ্কার্য বা ঘোষনা দিয়ে, যথা.... দেশ জিন্দাবাদ, হিন্দুস্থান মুর্দাবাদ, বাজী পোড়ান, ঐ খেলায় বিজয়ী দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানো ইত্যাদি নিজের দেশের অপমানজনক দুষ্কার্য করার স্বাধীনতা এখানে কোন অবস্থাতেই থাকবে না।

এক দেশ—এক নিয়ম।

উপরোক্ত মানবতাবাদী নিয়ম যে মানবে সে এই রাষ্ট্রের অংশ।

(৪৬) "উপসংহারের আগে"

"কাশ্মীর ১৯৯০ এই দীর্ঘলেখার কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি আবার কোন কোন স্থানে বিষয়ান্তরও আমি করেছি—এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। বারবার লেখা হয় না।

নতুন প্রজন্ম যেন চিন্তা করার, বিচারের বিকাশ করার সুযোগ পায় এই আমার আসল ইচ্ছা।”

(৪৭) “বাঁচতে হবে? তাহলে রাজ্যকে স্বরাজ্য কর”

আমরা রাষ্ট্র চালাচ্ছি। স্বরাষ্ট্র নয়। স্বরাষ্ট্রে রামজন্মভূমি, মন্দির জীর্ণদ্বার এ সমস্যা থাকে না! মন্দির মুক্তি আন্দোলন স্বরাষ্ট্রে করতে হয় না! ‘কাশ্মীর’ স্বরাষ্ট্রে সমস্যা থাকে না!

পাকিস্তান স্বরাষ্ট্র পেয়েছে, বিশাল মন্দির পাঠশালা করা হবে না গোশালায় রূপান্তরীত করা হবে একথা সেখানকার হিন্দুদের জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন পড়ে না।

রাষ্ট্রকে স্বরাষ্ট্রে পরিণত করতেই হবে। রাষ্ট্র যখন নিতে পেরেছি তখন স্বরাষ্ট্রও নেবো যে রাষ্ট্র আছে তাকে স্বরাষ্ট্রে রূপান্তরীত করতে হবে এই ইচ্ছা মনে স্পষ্ট হওয়া চাই।

স্ব-ত্ব র সঙ্গে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভাবী বংশধরদের, নিজেদের বুকে তলোয়ারের আঘাত খেয়েও শত্রুর মাথায় আঘাত করতে হবে! এসব তাদের ভালো লাগবে বলে নয়—অন্য উপায় নেই বলে।

স্বাতন্ত্র-বীর সাভারকরের সব অনুমান সেই সময়ে সত্য বলে প্রমানিত হয়েছে। কংগ্রেস দেশ বিভাগ করবে। পাকিস্তান নিত্য শিরঃপীড়া হয়ে থাকবে। এক পাকিস্তান সমস্যার সমাধান হবে না, সংখ্যালঘুর দোহাই দিয়ে পাকিস্তান বাদীদের উৎসাহ দেওয়ায় প্রত্যেক প্রান্তে অনেক পাকিস্তান তৈরী হবে। এই সতর্কীকরণ তিনি ১৯৪২ সালেই করেছিলেন (হিন্দু মহাসভা অধিবেশন/কানপুর)

তিনি আরও এক অনুমান করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কি ঘটবে তা ১৯৩২ সালেই, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন!

বিশ্বজয় করতে নয়,
যারা পরাধীন তাদের মুক্ত করতে,
“বাঁচো এবং বাঁচতে দাও”
এই সুস্থ ও যৌক্তিক শিক্ষার অবলম্বনকারীদের,
সমাজবাদেরই শুধু নয়—
সাম্যবাদের ও অগ্রনীদের,
সৃজনের রক্ষার জন্য—
সর্বজনের রক্ষার জন্য—
কোটী কোটী হিন্দুকে তৈরী হতে হবে
যুদ্ধের জন্য।

এই ছিল সেই অনুমান। সেই সময় সন্নিকটে!

"আজ গান্ধীবাদের মৃত্যু হ'চ্ছে। আমাকে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের সিদ্ধান্ত, ন্যায় বিচার আর রাষ্ট্র শাসন ক্ষেত্রে গান্ধীবাদী অহিংসা নীতির ব্যর্থতা সিদ্ধ করছে।"

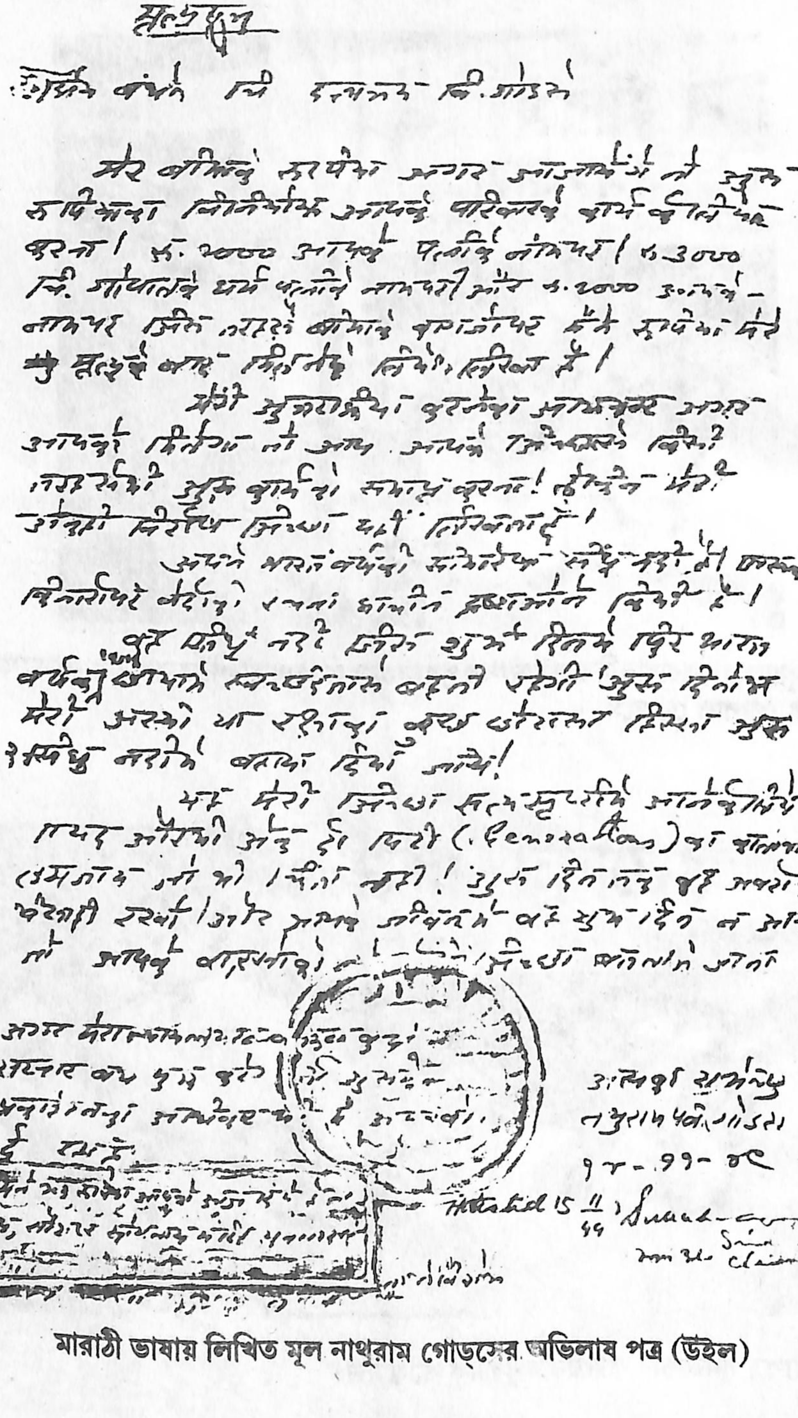
—নাথুরাম



নাথুরামের তিরোধান দিবসে ইচ্ছাপত্র পুনরুচ্চারের সভায় ভাষণরত নাথুরাম গোড্‌সের ভাই গোপাল গোড্‌সে।



ইচ্ছাপত্র পুনরুচ্চার করছেন অনুবাদক শান্তি দত্ত।



মারাঠী ভাষায় লিখিত মূল নাথুরাম গোড়সের অভিলাষ পত্র (উইল)

নাথুরামের অভিলাষ পত্র (উইল)

স্নেহের ভাই দত্তাত্রয়,

আমার বিমার টাকা পারিবারিক কাজে ব্যবহার করবে। ও থেকে দুই হাজার টাকা তোমার স্ত্রীকে, তিন হাজার টাকা গোপালের স্ত্রীকে ও দুই হাজার টাকা তোমাকে যেন দেওয়া হয়। তা আমি বিমার কাজগপত্রে আগেই লিখে দিয়েছি।

আমার শেষকৃত্য করতে দেওয়ার অনুমতি দিলে, অবশ্যই করবে। কিন্তু আমার একমাত্র ইচ্ছা জানাচ্ছি।—

যার তীরে বসে প্রাচীন ঋষিগণ বেদ রচনা করেছেন সেই সিন্ধু নদী যেদিন আবার স্বাধীন ও অখণ্ড হিন্দুস্থানের আধিপত্যে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হবে ; সেই শুভদিনে আমার চিতাভস্ম সেই সিন্ধু নদীতেই যেন ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

আমার এই অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হতে যদি কয়েক শতাব্দী সময় লাগে লাগুক, ততদিন পর্যন্ত ঐ চিতাভস্ম ঐ ভাবে রাখবে। আর তোমার ভাবী বংশধরদের আমার ইচ্ছা জানিয়ে যাবে। আর বলবে তারাও যেন তাদের বংশধরদের জানায়।

ন্যায়ালয়ে পেশ করা আমার বক্তব্যের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা, কেন্দ্রীয় শাসন কখনও প্রত্যাহার করলে তা প্রকাশনের অধিকার আমি তোমাকে দিলাম!

নাথুরাম বি গোড্‌সে
14-11-49.

ন্যায়ালয়ের শীল মোহর

প্রত্যায়ীত (Attested)
ন্যায়াধীশ প্রথম বর্গ
15/11/49 স্বাক্ষর।

পুনঃ আমি যে একশ এক টাকা আজ তোমাকে দিলাম তা তুমি সৌরাষ্ট্রে, সোমনাথ মন্দিরের যে পুনরুদ্ধার-এর কাজ চলছে তার চূড়ার কাজের জন্য সাহায্য হিসাবে পাঠিয়ে দেবে!

নাথুরাম বি গোড্‌সে
15-11-49
শুভ সকাল সওয়া সাতটা

(প্রত্যেক বছর পনেরই নভেম্বর নাথুরামের স্মৃতিচারণার উদ্দেশ্যে যাঁরা বাড়ীতে একত্রিত হন তাঁদের এই অভিলাষপত্র পড়ে শোনানো হয়, অনেক শাসকীয় আরক্ষী অধিকারীগণও অনুমতি নিয়ে উপস্থিত থাকেন।)

নাথুরামের ইচ্ছা অনুযায়ী একশ এক টাকা সোমনাথ মন্দির পুনরুদ্ধার মণ্ডলকে পাঠানো হয়েছে তার প্রাপ্তি স্বীকার রসিদে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্বর্গীয় এন. বি. গাড়্গিল এর স্বাক্ষর আছে। (লেখক)

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে খড়ক বাসলা বাঁধ ভেঙ্গে 'মুঠা' নদী প্লাবিত হওয়ায় পুনে শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাতে গোড়্সে পরিবারেরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে, ঘরে জল ঢুকে অন্য জিনিসের সাথে অনেক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও ভিজে গেছে।

চিত্রে (১৪০ পৃষ্ঠায় দেখুন) গোলাকৃত জায়গায় ন্যায়ালয়ের শীলমোহর অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এবং চৌকোনাকৃত জায়গায় রয়েছে নাথুরাম গোড়্সের 'শেষ হস্তাক্ষর'। অভিলাষ পত্র ১৪ তারিখে লিখে রাখলেও ১৫ তারিখে অর্থাৎ ফাঁসির কিছু সময় আগে ন্যায়াধীশ তা প্রত্যায়ীত (Attested) করেছেন। সেই সময় নাথুরাম গোড়্সে ঐ অংশটুকু জুড়ে দেন—(অনুবাদক)